অলংকরণ: শুভম দে সরকার

উপন্যাস

শালিমারে সংঘাত

একটি বিলিতি বোস থ্রিলার

শ্রীজাত

"'অল কোয়ায়েট অন দ্য ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট'। নাম শুনেছিস?"

"আলবাত!"

"কার লেখা?"

"এটা কি বই নাকি?"

"ডেফিনিটলি।"

"মনে পড়েছে। রাজেশ আগরওয়াল।"

"এই জনোই তোর কিছু হল না। খুব ক্লোজ গেলি যদিও।"

"ইশ...কার লেখা তাহলে?"

"বিনু ওয়াদ্দিয়া। চাকনিটা একটু শক্ত স্ক্রেন বেরিক হয়।"

এই কনফিডেন্ট কথোপকথন ঘটছে বেহালার একটা চায়ের ঠেকে, যখন বিকেল প্রায় ন্যাতানো পতাকার মতোই পড়ে এসেছে। রায়পাড়ার এই কুচো দোকানে সারাদিন আড্ডা চলে, তার মধ্যে এই দুই দিকপাল চিরস্থায়ী কাস্টমার। প্রশ্নকর্তা বছর বাহান্ন বিলিতি বোস, কাঁচা-পাকা চুলের এলোমেলোপনা, সঙ্গে একটা শার্প গাড়লি। ওদিকে সপার উত্তরদাতা টিনি দে। বিলিতি বোস পরে আছেন একটা বাদামি বুশশার্ট, যেটা বছর পনেরো আগে উপ সায় ছিল, লম্বায় পাঁচ ফিট তিন, চেহারা অনেকটা টমি দি জোজ আর অহীন্দ্র চৌধুরীর আশ্চর্য মিশ্রণ। এর চেহারা দেখেই সরকারি হাসপাতালে পায়ান্নারির ঘেমো বাবা এক চান্সে নাম রেখেছিলেন বিলিতি। বিলিতি বোসের ডাকনাম আছে বলে তার ডাই হার্ড এনিমিও শোনেনি। অবশ্যি হঠাৎ চাচাটারে গোড়ায় এনিমিই প্রশ্ন উঠছেই বা কেন, সে কথায় পরে আসছি।

উল্টোদিকে ভুল উত্তর দেওয়ার দুঃখে একটা প্রজাপতি বিস্কুটের ডানা চুষছে বছর ছাব্বিশেকের যে-সিড়িঙ্গেমার্কা বিঁটপাকানো ছেলেটি, তারই নাম টফি। তার বাবা অসীম দে এই অঞ্চলের বিখ্যাত প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। মেনলি ইংরেজি পড়াতেন, লোডশেডিং হলে কুচিপুড়ি ডান্স। সেই করতে গিয়েই একদিন বেহুড়ন্ড্যাঙানি খেয়ে চোক অফ করেন। তখন টফি মায়ের পেটে। ছেলে জন্মানোর পর তার মিষ্টি মুখখানা দেখে মা নাম রাখেন টফি। সেই টফি এখন ছাব্বিশের ডাগর বেকার।

তা এই বিলিতি বোস, যাঁকে পাড়ার বড় একটা কেউ ঘাঁটায় না, তিনি নাকি আন্ডার-কাভার এজেন্ট। সেরকম তিনি বলেন না কখনও, তবে সে কথা আর জানতে কারও বাকি নেই। যৌবন যখন শরীল-মনে এট্টি নিছে, তখন একবার টিকিট ব্রাক করার চেষ্টা করেছিলেন, ফুপ। তারপর আর্মি জয়েন করার ট্রাই। সেটাও ফুপ। অতএব ব্যাক টু বেহালা এবং বেকার। সেইসময় কলকাতার বিখ্যাত সেসরবার্ড ইন্টেলিজেন্স (যেন সরকারের কত ইন্টেলিজেন্স আছে), 'উপ প্রাইভেট' বিলিতিকে নবীন এজেন্ট হিসেবে শহরের রহস্যভরা বিমকি কোমডে হিল্লেই করে। তারপর বিলিতিকে আর ফিরে তাকাতে হয়নি। তাকানোর উপায়ও ছিল না, কারণ তাঁকে ঘিরে তখন শত্তুর ঝাঁক। এই জনোই এনিমির শত্তু বাড়তে শুরু করে। এইভাবে সৌড়তে-সৌড়তে বছর তিনেক আগে তিনি উপ প্রাইভেটের সো এজেন্ট হিসেবে ভূষিত হন, গোপনে তাঁকে প্রহিঞ্চও দেওয়া হয় (রাত আড়াইটে থেকে পৌনে চারটে পর্যন্ত রবীন্দ্রসদন বুক করে)।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এহেন এজেন্ট চায়ের দোকানে বসে কোন রহস্যের যবনিকা ফলদির্গি করছেন? উত্তরে এ কথা লুকিয়ে লাভ নেই, বিলিতি বোসের লাস্ট তিনটে অপারেশন যাকে বলে ঝণাং। এক উভটি চিয়ারলিডারের গোপন কেছো, বিখ্যাত সোনা ব্যবসায়ী মাসুম মুখার্জির বেড়াল চুরি এবং ডগনারাজ কুকুর চিকিৎসালয়ের মেট্রনের মোজায় হিরে—এই তিনটে কেসই সঁপে দেওয়া হয়েছিল বিলিতি বোসের করকমলে। তিনটেরই কোনও হিল্লে না হওয়ায় উপ প্রাইভেট এজেন্সির মুখ পুড়েছে, ফেজাঁট হিসেবে বিলিতি তিন মাস যাবৎ চায়ের দোকানে বসে কুইকু-কুইকু খেলছেন। এতে অবশ্য অন্যায় কিছু নেই, দুঃখ কেন!

আজও সেইরকমই একটা মাল্টুনিন গিয়েছে। এজেন্সি আর বিলিতিকে ফিরিয়ে নেবে কিনা, এ নিয়ে যেন বিলিতির মনেই সন্দেহ জাগতে শুরু করেছে। কারণ আর কিছুই নয়, ৩৭-এর এক নম্বর ছোকরা নাকি সেখানে জয়েন মেরেছে এবং মারামারই বসিরহাটে চোরাপাচার কেলেঙ্কারি ধরিয়ে দিয়ে এজেন্সির ব্যাজ বুকে এঁটে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই টাফ পরিস্থিতিতেও তিনি টফি দে-র জ্ঞান বাড়ানোর সমাজসেবায় নিয়ত। পরের কোশ্চেন দেগে দিলেন একটু পরেই।

"রোমের রাজধানী কী?"

টোনাল বিশেশ থেকে প্রশ্ন, আনসিন। ঠোঁটের কোনায় চাম্বি পাত্তে হাসি এনে টফি যখন জবাব দিছে 'ফ্যান্স', তখনও বিলিতি বোস বুঝতে পারেননি, দোকানের উল্টোদিকে ঘটে চলা ব্যাপারটা আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁর লাইফে নতুন এক্সাইটমেন্ট নিয়ে আসবে।

এখন দেখা যাক, উল্টোদিকে কী হচ্ছে। উল্টোদিকে এ অঞ্চলের কুখ্যাত দোকান, 'চৌধুরি সুইট'। উপর থেকে চুড়াস্ত ঘিঞ্জি ও নোংরা একটি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার, তলায়-তলায় এর ইতিহাসই আলাদা। তিরিশ বছর ধরে লাস্টিং করা এই দোকানের মিষ্টি কেউ কখনও নিজের, আত্মীয়স্বজনের বা বন্ধুর বাড়ি নিয়ে যায় না। তার জন্যে পাড়ার মোড়ে আলাদা দোকান আছে, সম্ভর সন্দেশ। চৌধুরি সুইটকে লোকে ইউজ করে একটু অন্যভাবে। সব মিষ্টির মিনিমাম তিনদিন আগের তৈরি, স্পেশাল পচা ছানা আমদানি করে তবেই। নতুন ক্রেশ মিষ্টি চৌধুরি সুইট বেচে না, তাতে গুলেট গুডউইলের চাপ আছে। অতএব শুকনো মিষ্টি, মানে সন্দেশ বা ওই জাতীয় আইটেম কিনলে মিনিমাম চারদিনের অ্যাসিডিটি গ্যারান্টি। আর বাইচান্স শক্তরা বেশি থাকলে, ডিরেক্ট রসের মিষ্টি। বিশেষত ন্যাংচো। আজ অব্দি বাড়ি বসে ও জিনিস কেউ হজম করতে পারেনি, মেডিক্সেম লেগেছে। এখন বলাই বাহুল্য যে, চৌধুরি সুইটের বিক্রি ফিফ্টি মারকাটারি, কারণ জেনারেল লোকজনেরও শত্তর কোনও মামতি নেই।

এখন যেটা একটু আগে টফির চাবুক ডেজর শুনতে-শুনতে বিলিতি বোস দেয়াল করলেন সেটা হল এই যে, এক্ষুনি কালো ওভারকোট, কালো টুপি, কালো সন্তানা আর কালো বুরবিন হাতে একটা লোক চৌধুরি সুইট-এর সামনে দিয়ে পার করল। তার আরও কী-কী কালো সেটা বুঝে ওঠার আগেই ক্যারেক্টার হাঁ। পিছন-পিছন একটু পরে বাইক বাগি চটভটিয়ে পাড়াতাগ করল। এটা আলাদা না এক ঘটনা, তা আমরা পরে বুঝতে পারব।

আপাতত বিলিতি বোস হাফতীক্ষ্ণ চোখ টফি দে-র দিকে ফিরিয়ে এনে বললেন, "ফ্রান্স নয়, বুলগেরিয়া।"

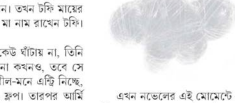

এখন নভেলের এই মোমেন্টে এটা জেনে রাখা দরকার যে, বাইক বাগি কী ও কেন। রায়পাড়ার ছোট্ট প্যাকেজের মধ্যে বাপিদের স্যামিলি বেশ হাইলি নাম করা আর কী। বাপির বাবা মোহন লাহিড়ি অসম্ভব রকমের জীনরেল লোক। হাইট পাঁচ ফুট হলেও, পার্সোনালিটি কুত্তুব মিনারীয়। ইয়া গোঁফ, যা আজকাল সাউথ কলকাতায় অবসোলিট, তার সঙ্গে বেশ দেদার চেহারা। তিন পুরুষের হেসিয়ারির ব্যবসা বলে সারাক্ষণ স্যাভো গেঞ্জি পরে থাকেন। ওটাই পারসিনিটি। তিন বছর আগে ডিসেম্বরে সিমলা বেড়াতে গিয়ে চাটু বরফের মধ্যে স্যাভো পরে পাঁড়িয়ে হাসছেন, সে ছবিও আছে। নিন্দুকেরা আড়ালে 'স্যাভো মোহন' ডাকে, সে আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ভদ্রলোকের রেলা আছে।

এখন হয়েছে কী, ছেলের জন্ম দিয়ে স্যাভো মোহনের স্ত্রী বিদায় টেনেছেন। সেই বাপি গ্র্যাজুয়েশন শেষ করে ফ্যা-ন্যা মারছে পাড়ায়। গ্র্যাজুয়েশনে ভাল রেজাল্ট করায় স্যাভো মোহন তাকে একটা থার্ড হ্যান্ড বাইক কিনে দিয়েছেন, লোকাল মেডা। তাইতেই সে পাড়া চষে হদ্দ হয়ে যাচ্ছে আর কী।

কিন্তু এমনি-এমনি তার নাম বাইক বাগি হয়নি। পাড়ায় আর-একজন বাগিও আছে, ক্লাস এইটের পর স্কুলের রাস্তা ভুলে ভ্যাগাবন্ড। তার টিপ দেখতে পাশের পাড়া থেকে ছেলেরা আসে। ব্ল'-দশ টাকা দিয়ে টিপসুও নেয় তারা। বাপি কোনও একটা দলে আছে মানে বাকিদের চিন। তার ষ্টাইক শুরু হলে থামে না। পাড়ার সকলে তাকে ষ্টাইক বাগি বলে ডাকে। এই ষ্টাইক বাগিরও অবশ্য যোগ্য রাইভাল আছে, সে আমরা পরে জানব। স্যাভো মোহনের ছেলের হেবি অভিমান ছিল, তার নামেই আগে কোনও বিভূষণ নেই, বাইক আসার পর সে দুঃখ হাওয়া।

এহেন বাইক বাগি কারও সাতে-পাঁচে থাকে না। সে কেবল সকাল হলে চান সেরে বাইক টেনে বেরিয়ে পড়ে। ভারি নির্মল টাইপের ছেলে। এমনত ছেলেকে ওই উপ চু বাটাম ব্ল্যাক লোকের পোছেন যেতে দেখলে রহস্যের গন্ধ পাওয়ারই কথা। বিশেষ করে তিন মাস ধরে বিলিতি বোসের হাতে যখন কোনও কাজই নেই।

"ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না রে..." ফাঁকা চায়ের গ্লাসে চুড়ুং চুং করতে-করতে আনমনে কথাটা বললেন বিলিতি, রেজাল্ট ছেলে টফি দে সেটা ক্যাচ করে নিল।

"কোন ব্যাপারটা বোসদা?"

এখানে বলা ভাল, টফির বাবা ছিলেন বিলিতি বোসের চেয়ে মারকাটারি ছেটা। সেই বোধ থেকে টফি প্রথমবার তাঁকে বিলিতিতেই বলে ডাকায় তিনি তীব্র অসন্তোষ নেন। তারপর থেকে এই বোসদা ব্যাপারটা চলছে। টফির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উল্টে পড়লেন বিলিতি বোস, টফি তাঁকে ফলো মারল সটান।

সেতারটা হাতে তুলে নিয়ে একটা ঐশ্বরিক ফুঁ দিলেন সঞ্জয় সোম। দুপুর আড়াইটে, সাধনার জন্যে পারফেক্ট মুহূর্ত। একটু আগে কড়ুর শাক দিয়ে ভাত মেরেছেন, সঙ্গে কুচো মাছের ঝাল, এরপর দুপুরের রাগ বড় টানছে তাঁকে। সঞ্জয় সোম এই সময়ে রেওয়াজ রেওয়াজে বসেন। অবিশ্যি তা বললে কোশ্চেন উঠতেই পারে যে, কোন সময়ে বসেন না। কাকভোরে উঠে পড়া তাঁর ছোটবেলার স্বভাব। চোখমুখ ধুয়ে ভিরেজি রেওয়াজ। ভোরের রাগ বাজান কিছু, আলাপ, জোড়, তারপর খালা। বাজাতে-বাজাতে মালতীমাঁটি চলে আসে। বাসন মাজা, ঘর মোছা, কাপড় কাচা, রান্না। এই এক ঘণ্টায় সঞ্জয় সোম ঝটিতি ব্রেকফাস্ট সেরে নেন, তারপর স্নান সেরে বসে যান। দুটো নাগাদ উঠে চাট্টি আহার্য গ্রহণ করে আবার রেওয়াজ। ব্যাপারটা চলে বিকেল পর্যন্ত, যতক্ষণ না মনার চায়ের ঠেকের কচি ছেলেটা একটা স্পেশাল কাটিং দিয়ে যাচ্ছে। আরাম করে চা খেতে পারেন না অবশ্য তিনি। সন্ধের রাগগুলো লাইন দিয়ে গুয়েট করে থাকে। চটপট বসে যান। রাতের খাবার ফ্রিজে রাখাই থাকে, ডঁ সাড়ে দশটায় যেয়ে দেয়ে আবার বসে যাওয়া। গভীর রাতের রাগগুলোই বা কী লেখ করল।

এখন বটমা হচ্ছে কী, এই যে এত রেওয়াজে মজে থাকেন সঞ্জয় সোম, তাঁর বাজনা কিন্তু কেউ সহ্য করতে পারে না। এমনিতে তিনি অশ্রাব্যই বাজান, তার উপরে হাইলি জঘন্য বাজে বলে। এবং কেবল জঘন্য বলে থেমে গেলে হবে না, টোটাল ক্ষতিকারক বাজনা। এ জিনিস শিখে হয় না, নিয়ে জন্মাতে হয়। সঞ্জয় সোমও অবশ্য সেতারের হাত নিয়ে জন্মেছিলেন। কর্মজীবনে ছিলেন সরকারি ব্যাঙ্কের চাকুরে, শেষ দশ বছর ম্যানেজারি করেছেন। ভিপিপি প্রোমোশন পেয়ে এক ব্রাঞ্চ থেকে অন্য ব্রাঞ্চে গিয়েছেন যে, তার মূলেও কিন্তু ওই সেতার। প্রতিটি ব্রাঞ্চের অ্যানুয়াল ফাংশনে একটা করে পারফরম্যান্সের পরেই অবধারিত বদলি, কারণ ও জিনিস আবার পরের বছর শুনতে হলে মারা পড়তে হবে। এই করে-করে সেতার গণ্ডে সঞ্জয় সোম বহু ব্রাঞ্চ ঘুরেছেন।

ভাল বাজনা এবং রাগের একেই মানুষের শরীরে পড়তে বাধ্য, এ তিনি বিশ্বিত করেন। তবে হ্যাঁ, এই চুড়ান্ত সাধনা ও সাকসেসের জন্যে বহু গামা-গামা স্যাক্রিফাইস তাঁকে করতে হয়েছে, সে কথা আলাদা। রায়পাড়ায় তাঁদের এই ঝরঝ পৈতৃক বাড়িতে তিন ভাইয়ের বাস ছিল। জাস্ট সেতারের কারণে বাকি দুই ভাই লিভি ও রাজস্থান চলে গিয়েছে। বিয়ে একটা করেছিলেন বটে সঞ্জয় সোম, অনিমা সেন বলে একটি ভদ্রঘরের মহিলাকে। তিনি অনেকদিন টেনেছিলেন। সাধক মানুষটাকে কেউ বুঝল না, আমি পাশে আছি টাইপের একটা লাস্তুভিলগাই মনোভাব নিয়ে সেতার সামলেই থাকছিলেন। তিনিও একদিন মানে-মানে কেটে পড়েন।

কিন্তু সঞ্জয় সোম সাধনার পথে একা এগিয়ে গিয়েছেন, আজও যাচ্ছেন। চিরাচরিত রাগ-ফাগ বাজানোর জন্যে তাঁর জন্ম হয়নি, তাই গোড়া থেকেই তিনি নিজের রাগ নিজে বানিয়ে বাজান। যেমন আজ দুপুরেই বাজানেব হটপটছীপা। পাঁচীপোর সঙ্গে একটু টেম্পারেচার অ্যাড করে আর কী। এমন রাগ তাঁর বহু আছে, এই নভেল এগোলেই মোলাকাত হবে। এসব মানুষ্যাকার্ভার রাগ আরও বহু হ্যাপা। অবিশ্যি আসল রাগগুলোকে স্পেয়ার করেছেন বলে একবার সংগীত অকাদেমি তাঁকে সম্মান জানানোর কথাও ভেবেছিল। তিনি রিজেক্ট করেন। তাঁকে সম্মান দেওয়ার মতো টিম তৈরি হয়েছে বলে সঞ্জয় সোম বিশ্বিত করেন না। তাঁর মতে, তিনিই এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ট্যালেন্ট। শুধু সেতার কেন, টোটাল সংগীত ব্যাপারটাকে কাউন্ট করলেও তাঁর মতো মহীরুহ আর আসেনি। বাজারে যাদের চাট্টি নামডাক হয়েছে, সে নেহাত পাবলিসিটি।

যুউব আগে পাড়ার একটা পত্রিকা 'সঞ্জয় কাকু সঞ্জয় কাকু ইন্টারভিউ দিন না' বলে এসেছিল, তাদের তিনি বলেছিলেন, "ববু আর বিলু তো সেতারটা ধরতেই শিখল না। জাস্ট ফ্রাঙ্ক নেন গেল। আমার মতো ব্যাঙ্কের ম্যানেজারি তো ডা-ল করতে হয়নি।" বলাই বাহুল্য, সে ইন্টারভিউ ছাপা হয়নি। তবে হ্যাঁ, পাড়ার লোকজন যে-কোনও মোমেন্টে এই একটি লোককে সমবেত হলে। কোনও তর্ক-থামেলায় যায় না।

আজ তাঁর মন বড় ভাল। এক তো এই যে, সুপার খেতে হয়েছে কুচো মাছের ঝালটা। তার উপর এই যে হটপটছীপের নতুন বন্দিশ মাথায় লাগি মারছে। তার জাস্টিস চাই। আব্বির গিলে করা পাঞ্জাবি আর চোস্ত পরে সেতারটা নিয়ে তেতলার রেওয়াজ ঘরের শতরঞ্চিতে বসেছেন সঞ্জয় সোম। বাইরে একচল্লিশ ডিগ্রির গরম, তাঁর কোলে একটা জাম্বুবান শাল আদতো করে ফেলা। ঢুলু চোখ এনে সবে ঘরজোড় তাতে একটা লহরা ডাঁড় মারবেন, কলিং বেল বেজে উঠল।

এ তো বড় সহজ কথা নয়! সারা পাড়া জানে এই সময়ে এই উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ সংগীতবাজ রেওয়াজ মারছেন, এমন মহার্ঘ্য মোমেন্টে বেল বাজানোর অজ্ঞানতা বা দুঃসাহস কার হল? পৃথিবীর বেস্ট সেতারটাকে শতরঞ্চিতে নামিয়ে রেখে বিরক্ত হয়ে উনিতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন তিনি। কোন গামবাট এই কাজে নিযুক্ত, এ কথা ভাবতে-ভাবতে দরজা খুলে সঞ্জয় সোম জাস্ট হাঁ। তিনি কি ঠিক দেখছেন?

লাভলি আজ কলেজ যায়নি, ম্যারিয়াম দিনের মতোই। সকাল-সকাল স্নান-টান সেরে ফ্রেশ-টেশ হয়ে নিজের ঘরে গানম মিউজিক চালিয়ে নাচ প্র্যাকটিস করছে, মুহুর বাংলা চ্যানেলে 'নাচ মেরি বুলবুল' কম্পিটিশনের সিক্সিথ থ্রি-ত এন্ট্রি নেওয়ার একটা ডেভিল জাম্প মারব বলেল।

এইখানে লাভলি ও তার স্যামিলি'র একটা মিনিমাম ইন্ট্রো দরকার। লাভলিদের বাড়ি এ পাড়ায় সবচাইতে বড়লোক ও কুকুরসম্পন্ন। দুটো হুমলো হাউন্ড সারাক্ষণ ল্যা-ল্যা করে বাড়ির এ মাথা-ও মাথা চষে বেড়াচ্ছে। তাদের নাম রিগেড আর প্যারেড। এক সময় লাভলির বাবা খুব পলিটিক্যাল মাইন্ডেড ছিলেন, সব ছেড়েছুড়ে দিতে হয় বলে কস্টালজিয়া বুকে আঁকড়ে কুকুরদের এই নাম রেখেছেন।

লাভলির বড়লোক, কারণ লাভলির বাবা তিলু রায়ের সোনার গয়নার চালাও বিজনেস। ১৯৯৬ সালে কলকাতার বুকে একসঙ্গে পাঁচটা দোকান ওপেন করেন। সেই বছরই লাভলির মিষ্টি জন্ম বলে, সবক'টা দোকানের নাম এক যারসে মেয়ের নামে দেগে দেন। লাভলি জুয়েলারি ওয়ার্কস, আসলি লাভলি জুয়েলারি ওয়ার্কস, লাভলি আসলি ওয়ার্কস জুয়েলারি, ওয়ার্কস আসলি জুয়ে লাভলি লারি এবং জুয়েল আসলিরি ওয়ার্কলি লাভস।

এহেন লাভলির জীবনে যে কলেজ যাওয়া তুচ্ছ হয়ে উঠবে অচিরেই, সে আর বলার কী। তবে কিনা, লাভলি এই কুড়ি বছর বয়েসেই হেবি ইন্ডিপেন্ডেন্ট। সে ঠিক করে নিয়েছে জীবনে কী-কী হবে এবং কী-কী অ্যাভয়েড করবে। প্রথমেই সোনার ব্যবসা এবং এনজিও। এই দুটোই তার বিলিমিলি দু'গোয়ের পয়জন। সে এই প্রতিযোগিতার কাদামাখা নিষ্টুর ওয়ার্ল্ডে নিজের স্কেম কায়েম করতে চায়, যে-কোনও হাই প্রাইসে! হয় নাচ, নয় অভিনয়, এই তার টার্গেট।

এখানে বলে রাখা ভাল, মাত্র কুড়ি বছরেই লাভলির শরীল টি-টোয়েন্টি'র মতো উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ছিপছিপে, আগেকার দিনের রেশনের গমের মতো উজ্জ্বল বাদামি গায়ের কালার, ছোট করে ছাঁটা চুল এবং জমাটি মাপের ভাইটাল স্ট্যাট তাকে টাইমে বোমা করে তুলেছে, যার বুকে কান পাতলে সলটিকটিকানি শোনা যাবে।

লাভলির আরও একটা ব্যাপার আছে, যেটা সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। জেন। যেমন ঝাম্বাইমার্কা বৃষ্টিতে স্টাসজল্ডে যেতে হেজে করল। এর জন্যে তো পয়সা লাগে না বেশি, এলেম লাগে। লাভলির জন্যে একটা গাড়ি আর ড্রাইভার রাখাই আছে। নিয়ে চলে গেল সোনারপুর স্টেশন, বেহালা থেকে, ভর সন্ধেবেলা। স্টাসজল্ড যেহে যখন বেহালায় ঢুকছে, তখন জাস্ট চোরেদের প্রকশেনাল টাইমটা শুরু হচ্ছে। মুশকিল হচ্ছে এই যে, ব্যাপারটা সব সময় স্টাসজল্ডে লিমিটেড থাকে না আর। যাই হোক, সেসব সাবজেক্টে পরে লাইট ফেলা যাবে।

আপাতত এই ঘোর দুর্দুরবেলায় লাভলি সবে নেচে উঠেছে। একটা কালো চাপা হাফস্ল্যাক আর ঝোলা থিয়ে টপ পরে নাচছিল লাভলি, দুটোই ভিজে ডবল চোরাখুন্তি হয়ে গিয়েছে। সে দুটো ছেড়ে আয়নার সামনে দাঁড়াল সেসা। বেলজিয়াম গ্ল্যাস, বঙবাজারের আয়না, তাতেই তাকে মারকাটারি

দেখাচ্ছে। ড্রপ-ড্রপ ঘাম ডাইঙ মারছে তার হাল্কা বাদামি গাল, চিবুক, ঘাড়, কাঁধ থেকে নীচের দিকে। একটা বাগাদি কালারের রা, যে তার আলতো বুকদুটোয় মুখ গুঁজে আছে আর বাঁশপাতা রঙের ক্রিভেজকে যাচ্ছেতাইভাবে উস্কে দিচ্ছে, আর-একটা ঘন রাউন প্যান্টি। ব্যাস, এ ছাড়া তার শরীরের কোনও সাক্ষী এমন নেই। ঠিক এইরকম দিগার আঙ্গলান কাগজের তিন নম্বর পাতার নীচের দিকগুলোয় রাজত্ব করে। ঠিক এইরকম। একটু বেশি না, একটু কম না। তাদের যখন হয়েছে, লাভলি পারবে না জীবনটাকে ছিনিয়ে গলায় চেন পরিয়ে দিতে?

আজকের কথা এখানে আলাদা করে টেনেটুনে বলা যে হচ্ছে, তার একটাই কারণ, আজ লাভলির লাইনে স্পেশ্যাল ডে। অনেক দিনের একখানা ড্রিঙ্ক আজ তে পূরণ করতে চলেছে। এই গোপন ডেজারে সে সঙ্গী করেছে পাড়ারই একটি ললিতলবঙ্গ যুবককে, যে তার থেকে এট্টু বড়, কিন্তু মন্দ না। সত্যি বলতে কী, ছেলেটার প্রতি এক-দু'বার ফুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে খুব মন্দ লাগেনি লাভলির।

স্নান সেরে একটা ডেনিম ক্যাপ্রি আর হালকা ফুরফুরে সাদা টি পরে পাড়ায় বেরোল টি-টুয়েন্টি লাভলি রায়, চোখে সানগ্লাস। এ সময়ে সে মাথেমধ্যে বেরোয় বলেই পাড়ার উমুখুমু যুবকদল নানা কাজের অছিলায় রাস্তায় ঘোরে। রোদে চামড়া তেতিশিশ হয়ে যাচ্ছে, তবু, এক ঝলক জনসায় বলে কথা! আজও তারা দেখল, অপচিমায় সাইজের পিছনটা রিয়ার ছেলের মাপে ৬.৭ হাশলা দুলিয়ে লাভলি হেঁটে পাড়ার মোড়ে যাচ্ছে। এই সময়টা ঝুমে গেল ওঠে, আরও নানা জায়গায় ওঠে, তবে সেসব কথা মুখে আনার নয়।

রিক্সা থেকে পাড়ার মোড়ে যখন নামছে লাভলি, তখন এট্টু ডিসটেন্সে, বাস স্ট্যান্ডটা ছাড়িয়ে, ডায়মন্ড হারবার রোডের পিচের সঙ্গে টায়ার মাখিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লজঝড়ে বাইক। আর তার উপর মায়াময় এক ছোকরা ওয়েটিং। লাভলি কখনা বা বাড়িয়ে নিজের প্রথম নশতাহ্যুগল সেই বাইকের সিটের উপর সেটশ করে ছেলেটির কাঁধে একটা আলতো প্রেশার দিতেই বাইক রওনা দিল। তারা চলেছে চারাতলার দিকে, সম্ভবত।

এখন, টেমিয়া গ্রীষ্মের দুপুরে এই ঘটনার মধ্যে কোনও স্পেশ্যালপনাই থাকত না, যদি না দেখা যেত, উল্টোদিকের একটা বন্ধ রেস্তোরাঁর সেতলার জানালার ভাঙা কাচ ভেদ করে একজোড়া কালো গ্লাডস পরা হাতের দুপরিন এসব সাইলেন্সলি দেখছে। শুধু যে দেখছে তা-ই নয়, দেখা কমন্ট্রিট হাতের ওই গ্লাডস পরা হাত দিয়ে একটা মোবাইলে কী সব নম্বর ডায়াল করে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। তার মুখ অবশ্য এখনই দেখা যাচ্ছে না, যেমন কোনও নভেলেই যায় না। তবে দেখা যেটা যাচ্ছে সেটা হল এই যে, লোকটার পরনে, এই চণ্ডাগ্নাবি গরমেও, একটা কালো ওভারকোট। যেমন সব নভেলেই থাকে আর কী।

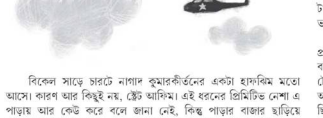

বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ কুমারকীর্তনের একটা হাফবিম মতো আসে। কারণ আর কিছুই নয়, স্ট্রেট আশিম। এই ধরনের প্রিমিটিভ নেশা এ পাড়ায় আর কেউ করে বলে জানা নেই, কিন্তু পাড়ার বাজার ছাড়িয়ে পীউচর্পি কারখানার লেতলায় দু'কামরার আস্তানা গেড়ে থাকা কুমারকীর্তন যে বিকেলের পরেই আশিমাছন্ন, সে খবর আর কারও জানতে বাকি নেই।

এখানে কুমারকীর্তনের ইন্ট্রি সামান্য না ঝামেলাে পাবলিক পরে ঝাড়বে। বাবা নিতানন্দ পাল ছিলেন গুরিজিনাল কীর্তনিয়া। নদিয়া থেকে টোটাল বাংলায় পারসর্ফ করে গিয়েছেন লগিয়ে। একটা সময় টানা বিশ বছর কৃষ্ণকীর্তনে নিত্যানন্দের কোনও রাইভাল ছিল না। যেখানে ম্যারাপ, সেখানে চোখের জল। এক সময় এত গো করতে লাগলেন যে লোকে বলতে লাগল নিত্যানন্দের ডাঁম বেরিয়েছে।

জানা ইচ্ছি কীর্তন তো গাইতেনই, পাশাপাশি সুপার অ্যাপিলিং রাধাকৃষ্ণ সিরিজের কীর্তন নিজে টিউন বানাতেন। সেসব ক্রিয়েটিভ মুহূর্তের সিল্কে সাক্ষী থাকত তাঁর ছেলে, কানাই। মা-মরা ছেলেকে পসিবিলিটির উপর দিয়ে আদর মেরেছেন নিত্যানন্দ। ফেল হয়েছে এই, লিটিল কানাইয়ের ক্ষমিডেক্সটাও ওভার হয়ে গিয়েছে। বাবার সঙ্গে মাঝে-মধ্যে কলকাতার মাঠেঘাটে গো করতে এসে শহরের ঝক্করঝাঁই দেখে ওই ছোটবেলা থেকেই সে ভেবে নিয়েছে, কব্বার অব ডাই।

এখন হল কী, কুড়ি বছর টানা ওইরকম সুপারজেট স্পিডে ম্যারাপ মাতাতে গিয়ে নিত্যানন্দ রিটায়ার্ড হার্ট হলেন। একদিন অসুস্থ অবস্থায় খাটিয়ায় লেটে-লেটে ছেলেকে নির্দেশ দিলেন, প্রতিভা হ্যাণ্ডওভার হল। সেয়ানা কানাই এই রাস্তাটাই অপেক্ষা করছিল। ততদিনে হয়েছে কী, চারপাশে কীর্তনের বাজার হাইট মিমিয়ে এসেছে। লোকজন এট্টু অন্য জিনিস চাইছে। পুটো ভেডি আইটেমের মধ্যে বাদমবাবুয়া করে কীর্তন গুঁজে-ফুঁকে দিচ্ছে আর কী। সে তো রীতিমত ইনসাল্ট! ২৩ বছরের সিগনু কানাই ঠিকই করে রেখেছিল, কীর্তনকে নতুন লাইফ দেবে সে।

স্ন্যানমতো কুমারকীর্তন নাম নিয়ে ফেলল এক সেকেন্ডে। তখন নামের আগে কুমার ব্যাপারটা যাচ্ছে ভাল। নিত্যানন্দর টানা ২৩টা কুবির সে নিজের দায়িত্বে এনে ফেলল। এক কৃষ্ণের স্রেসিংএ ও নিজের স্রেডিংএ, বলতে নেই, সুন্নারহিট হল তিন রাতের মাথায়। ৭৫ কিলোমিটারের মধ্যে কীর্তনের হারানো প্রহিড ল্যাজ গুটিয়ে ওয়াপস। রাত আর কিলোমিটার বাড়তে থাকল।

এখানে প্রশ্ন থেকে, রাতারাতি রাধাকেষ্টর কেত্তন এই পরিমাণ মর্ষদা লাভ করল কোথা থেকে? অবশ্য আসল আর কিছুই না, কুমারকীর্তন পুরনো লিরিকগুলো এক রেখে ক্লাসট সুরগুলো পাল্টে দিল। হিন্দি হিট-হিট বইয়ের হিট-হিট সব থেকে সুর নিয়ে আর কীর্তনের লিরিকে গুঁজে দিতেই সেসব গমহিট। এগজাম্পল দেওয়া যাক, 'মোর কানু বিনে আর মন চলে না, কী করি বল না সখী' এই পপিরি সুর পাল্টে 'রুম মারো রুম'-এর টিউন বসে গেল। ব্যাস, হিট হতে দু'সেকেন্ডও লাগেনি।

সবই সেটিং মাফিক ফলিছল, মাঝখানে থেকে বাদ সাধল একটি ডিভিও। সবে-সবে আর্টফেন যিনু হয়েছে। একদিন সন্ধেবেলা ফাংশন থেকে ফিরে কুমারকীর্তন গা হুতে গিয়েছেন, এমন সময় এক কালানে আথরঅ্যান 'দেখুন জাঠামশাই ছেলে কী গান আজ গেয়েছে আপনার' বলে গন্ডাপ হয়ে প্রোগ্রামের রেকর্ডি ফোনের মাধ্যমে লাইং নিত্যানন্দের সামনে মেলে ধরেছে। গানটা ছিল নিত্যানন্দের বড়ই প্রিয়, 'আজি মধুরায় এত আলো গো, কে বেল আমার কানু কালো, কারা বেল কানু কালো গো'। এই হচ্ছে পপ। নিত্যানন্দ লেখলেন, গানটা অন্য এক ডিগিওই সুর ও খচাখাই দুবে নামানো হচ্ছে। প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলেন না। দু'সেকেন্ড পরে মালুম হল, সুরটা মুঝা অফিজেল গাওয়া 'ম্যায় মর্দ টাঙেওয়ালা'-র। স্ট্রেট অ্যাটাক, কুমারকীর্তন গা মুছে বেরনোর আগেই সম্পূর্ণ ডেভ।

এই ঘটনা কুমারকীর্তনের মন-স্যন একেবারে ভেঙে দিল। তিনি সেকেন্ড-হ্যান্ড গাড়ি আর টিম নিয়ে শহর কলকাতার রাস্তাগুলো ঝেঁটিয়ে এসে জুড়লেন। রায়গাঞ্জায় তাঁর ট্যালেন্টের কদর থাকলেও, কারণ সঙ্গে বড় একটা মিট করেন না কুমারকীর্তনা। তবে হাঁ, একজন সেই গোড়া থেকেই বিকেল পড়লে হাজিরা দেন, তাঁকে মন্দ লাগে না কুমারকীর্তনের। তিনি কখনা বলতে হয় না, হুঁ-হাঁ জায়গামতো মেরে যেতে পারলেই হল। আর একটা টাইমের পর কী বলছেন ভাল করে বোঝাও যায় না। সেটা কিছুটা ভদ্রলোকের কথার জন্য, বাকিটা আফিমের কেয়াখাত।

ভদ্রলোক আজও হাজির হয়েছেন, যখন কিনা কুমারকীর্তন আফিমের প্রথম পবিত্র পুরিয়াটি গলা থেকে নামিয়েছেন ভিতরে। নাম, লোকেন সেন। বয়েস, ৬৫। হাইট ৫ ফুট। শিক্ষাগত যোগ্যতা, কেউ জানে না। কেরিয়ার, টোটাল রাজনৈতিক এবং ব্যামাখাণ। এইখানায় এট্টু এক্সপ্লেন না করে দিলে অন্যায় হবে। শোনা যায়, খুব ছোটবেলায় লোকেন সেন ইশ্বকুল মাস্টার ছিলেন। খুব ছোট একটা স্কুলের। কিন্তু মন দিল সাংঘাতিক পলিটিক্সান এবং আথা-রাশিয়ান। শোনা যায়, বসে আঁকো কম্পিটিশনে জিতে তিনদিনের ট্যুরে সোভিয়েত রাশিয়া ঘুরতে গিয়ে কমিউনিজ্মে দীক্ষা-ফিক্ষা নিয়ে ফেলেন। সেই থেকে পার্টির পার্ট-টাইমার। কিন্তু মুখলিল হচ্ছে, কোনও পার্টিই তাঁকে বেশিদিন রাখেনি। লেফট্ দলগুলোর সবকটা উছেছই মাসক'য়েক করে ঝাড়িয়েছে, তারা কেউ রাখেনি। তারপর চূড়ান্ত হতাশায় মনে-মনে রাশিয়ার কাছে ক্ষমা চেয়ে ডান দলগুলোও ট্রাই করেছেন, কেউ রাখেনি। কারণ একটাই, ওঁর ইংরেজিতে কথা বলা এবং বলেই যাওয়া। সে ইংরেজি অবশ্য সুদ্ধ অবস্থায় শোনা যায় না। এখন, আফিমের কারিগরির সৌলতেই একটা বর্ম তৈরি হয়ে যায় কুমারকীর্তনের মনে। ফলে লোকেন সেনকে অন্তো ডেঞ্জারাস বলে মনে হয় না তাঁর। আজও সন্ধেবেলা অন্যদিনের মতোই ফুল মাত্রাঞ্চক ইংলিশে কথা বলে যাচ্ছিলেন লোকেন সেন।

"হোয়াট ইউ থিংক ডু দিস পার্টি অফ লাইন উইদ সাবসেন্স ফিউচার?"

কুমারকীর্তন হাফবিমের একটা 'উঁ' বলেনন। তাতেই ডবল উৎসাহ

পেয়ে গেলেন লোকেন সেন।

"একজাক্টলি। আই সে যে ইন দি মিন টাইম ইট ইম্পসিবল ইজ সারভাইভ টু দ্য পলিটিক্স। ইন ফ্যাক্ট দ্য উইথ কেস সিন্যারিও..."

'একেবারেই, একেবারেই,' বলে একটা এঁড়ে প্রশ্ন দিয়ে বসলেন কুমারকীর্তন। সেটা ক্যাপচার করে নিয়ে লোকেন সেন আর-একটা নাগেথিন ইংলিশ বাক্য আনতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে কুমারকীর্তনের ফোনটা বেজে উঠল। কোনও অবুঝই এখন নম্বর হাঁকড়েছে, বিরক্ত মুখ করে সেটাই প্রকাশ দিতে চাইলেন কুমারকীর্তন।

'নাইস ইভিনিং। টেক কল ইউ?'

লোকেন সেনের সামান্য প্রশ্নটা এড়িয়ে কলটা তুলেই নিলেন হাফবিদ্ধ কুমারকীর্তন। তোলার সময়ে যেয়াল করলেন না নম্বরটা। করলে দেখতেন, তাতে পনেরোবার্তা ডিজিট দাঁত বের করে হাসছে। ফোন তিনি ধরলেন বটে, কিন্তু ওপাশে মহা ঘমঘমানি। ঠাঁদাড় রেডিওর মতোই। কেবল সেসব ভেদ করে ঘড়ঘড়ে পুরুষকণ্ঠে একটি লম্বা বাক্য শোনা গেল, যা টপ টু বাটাম লোকেন সেনের ইংরেজির চাইতেও দুর্বোধ্য। তারপরেই খটাস।

"দু?"

সংক্ষিপ্ত এই কোশ্চেনে আর কোনও ব্যাকরণ ভুল করলেন না লোকেন। কিন্তু বিরলতম সেই ঘটনা কুমারকীর্তনের চুলুনেস এড়িয়ে গেল। তখন তিনি ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা নিচ্ছেন।

"কে সেটা তো বুঝলাম না, কী ভাষায় যে বলল, সেটাও বুঝলাম না।"

"স্ট্রেঞ্জ ইউ হেভ আন্ডারস্ট্যান্ড বাট ডিডায়াল থিংক।"

ভাবগম্ভীর মুখ করে কথাটা যখন বললেন লোকেন সেন, কুমারকীর্তনের জানলার স্যাঁকা শার্সির বাইরে তখন সন্ধে ঝিকিমিকি। তবে তার উত্তরটা ভাল এল না।

"লোকেনবাবু, বাংলা বলবেন প্লিজ? একসঙ্গে দুটো অজানা ভাষা ডিল করতে পারছি না।"

"আপনাদের মশাই ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে নজরই নেই। যাক গে, বলছিলাম, রিয়ায়াল কত দেখুন না একবার। আর হ্যাঁ, আমার বাংলায় কিন্তু অনেক মিস্টেক থাকে, ও নিয়ে ভাববেন না।"

"এই দেখুন না, পনেরো ডিজিটের নম্বর। তার মধ্যে সামনে আবার স্প্রাস বসানো। এ তো মনে হচ্ছে বিদেশের কল।"

"বিদেশ-টিদেশে কীর্তন লোকে নিচ্ছে, বলছেন?"

"আরে কী বলল, সেটাই বুঝলাম না, প্রোগ্রামের কল কিনা কী করে বুঝব?"

"তা-ও বটে, তা-ও বটে। দেখুন, আবার হয়তো করবে আপনাকে। আই মিন, ফোন।"

"সেটা বুঝেছি।"

"তবে কী জানেন, চারপাশ তো ভাল না, সাবধানে থাকবেন। দিনকাল খুব খামেলার।"

হেবি কনসার্ন নিয়ে কুমারকীর্তনকে কথাটা বললেন লোকেন সেন। পাড়ায় এই একটি বাড়িতেই তো তাঁর এট্টি টিকে আছে এখনও।

"কী বলতে চাইছেন ক্লিয়ারলি বলুন তো?"

"আরে কিছুই না তেমন। আমি তো অনেকগুলো নিন দেখলাম। লোককে চ্যু করে বিলিভ করতে পারি না আর। মনে হয়, এই বুঝি ভুলভাল কিছু করে দিল। তাছাড়া, কী জানেন, আমার সেভেন্থ সেন্স বলছে, সামনে কিছু একটা ঘটবে।"

"সেভেন্থ সেন্সঃ সেটা আবার কী?"

"সিক্সের পরেরটা। সেভেন্থ। অনেক লোকেরই নেই, আমি ঘষে-ঘষে ডেভলাপ করেছি। মিলিয়ে নেবেন। ব্যাড কমিং ডে।"

কথাটা শেষ হতে না হতে সঙ্কেত লাস্ট সূর্যমুখী আকাশে একটা চিল পেনসুল চিৎকার ছিটিয়ে শাঁ করে ভেসে বেরিয়ে গেল।

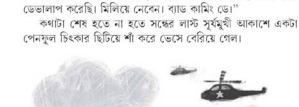

একটা বাইক নিরন্তর কানকি মেরে ছুটছে। সামনে হেলমেট পরা বাইক বাপি, পিছনে লাভলি রায়। সন্ধেটা নামছে এলেমবার।

"বাই দ্য ওয়ে, যাচ্ছি কোনদিকে?"

প্রশ্নটা বাইক বাপির, কারণ তার টিমসে পিঠে নরম বুক ঠেকিয়ে বসে আছে তার পাইলট ও ন্যাভিগেটর। সে যেদিকে বলবে, বাইক সেদিকেই কান্নিক মারবে।

"তোমার কী মনে হয়, আমরা কী করতে বেরিয়েছি বাপি?"

"সিগ্নেল। ডেটিং।"

"তোমার মনে হয় আমি তোমার সঙ্গে ডেটিং-এ বেরিয়েছি?"

"হ্যাঁ, মানে, বন্ধুদের তো তাই বলেই কাটালাম। নইলে 'সাঁসো মেঁ টারজান' বইটা দেখতে যাবার টিকিট কাটা ছিল।"

"তাহলে সেটাই যেতে পারতো। কোন আক্কেলে আমার সঙ্গে ডেটিং-এর কথা বলতে গেলে বলো তো? তোমার না, বাপি, একদম পেশেন্স নেই।"

"কিক হচ্ছে। পেশেন্স আমার পোষায় না। টুয়েন্টি নাইন অনেক ভাল।"

বাইক বাপি অ্যাজেন্টেডের আর-একটু চাপ দিয়ে বাইকটা ঝুঁকিয়ে দিল ধর্মতলার দিকে, যেখানে গ্র্যান্ড হোটেলের ছাদ থেকে লিকুইড সঙ্কে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ছে এখন। জাস্ট চেখে নেবার অপেক্ষা। মেয়েটা তাকে নিয়ে ঘুরছে, কিন্তু যেন ঠিক তাকে নিয়ে ঘুরছে না।

লাভলির নির্দেশমতো বাইকখানা এন্টি নিল সন্ধেবেলার একটা অন্ধগলিতে। এক মোমেন্টে একটা অন্য কনভাক্সই ব্যাপার হাজির হল চোখের সামনে। চারদিকে ঘুপচিঘুপ ফরম্যাটের লোকান, লাল নীল বেগনি ঝাঁসা হেডলাইট মেরে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যেই কাঁধে এক্সট্রা চাপ অনুভব করে একটা দোকানের সামনে বাইক দাঁড় করাল বাপি। দোকানের নামটা পড়েই একটা খড়সভাব এল বুকে। লাভলি বলল, "কাজটা বুঝলে এবার?"

"তুমি ট্যাটু করাবে?"

"হ্যাঁ। কেন? ট্যাটু কি গোরিলারা করায়?"

"না, মানে, ঠিক তা নয়, কিন্তু...মানে..."

"মানে কী, শুনি?"

"মানে, আর-একটু বড় হয়ে, মানে, আর ক'টা বছর পর..."

"বড় হয়ে মানে? আই অ্যাম অ্যান অ্যাডাল্ট! চলো এখন।"

বাপি পরজা ঠেলার সময়ে নামটা মনে-মনে আর-একবার দেখে নিল। 'ট্যাটু কি আয়েশি বারাত'। কোনও কথা হবে না।

ঢোকা মাত্রই একটা গলসাইজের লোক বলল, "অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল তো?"

"অফকোর্স," নিজের ডবল ডিমাই ঝকঝকে স্মাইলটা ইউজ করল লাভলি। এরপর দু'জনের এন্ট্রি হল আরও ভেতরের একটা লাল আলো জ্বলা ঘরে, যেখানে চশমা পরে বিখ্যাত তরুণ ট্যাটুকার বসে আছে। সামনে খাতা, তাতে হরেক ডিজাইন। লাভলি বাইক বাপির তোয়াক্কা না করে নিজেই উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। বাপি মাঝে এক-দু'বার সাজেস্ট করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু লাভলি যেভাবে তাকাল, তাতে বাপির গলা শুকিয়ে গেল।

"ওকে। আই উইল গো সড় দিস।"

একটা হরিণের মাথা, দু'দিকে শিঙেত বলল দুটো বড় পিস্তল গজিয়ে উঠেছে।

"রিলিয়াস্ট। আ ডেরি রেয়ার ওয়ান।"

তরুণ ট্যাটুকার সম্মতি জানাল। বাইক বাপি দেখল কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সে ওই লাল আলোর মধ্যেই চোখ বন্ধ করে দেখতে গেল, ফুলশয্যার রাতে লাভলির লাল ব্লাউজের কানা উঁকিয়ে উঁকি মারছে একটা পিস্তলের নল। বন্ধগলা ব্লাউজ ছাড়া বিয়ে করা যাবে না কিছুতেই, প্রায় এই ডিসিশনে যখন এসেই গিয়েছে বাপি, তখন চোখ খুলে তার দম আটকে গেল।

তার সামনে এবং ওই লোকটার সামনে উইথ নো লজ্জা ক্যাপ্রি নামিয়ে চুলের উপর বসেছে লাভলি। বাপির ভিসমি খাবার জোগাড়। কিন্তু দেখতে তাকে হলই, যখন আড়াই ঘণ্টা ধরে ওই তরুণ ট্যাটুকার লাভলির সিল্কেট কোমরে পিস্তলগুলা হরিণের মাথা আঁকল।

"আমি বলছিলাম কী, একটু উপরের দিকে করলে হতো না? মানে পিঠ পিঠে এতখানি জায়গা খালি পড়েছিল..."

রাত সাড়ে ন'টায় সব চিবনো ডবল চিকেন রোলের চাপা ঢেকুর আটকে আমতা-আমতা স্বরে প্রশ্নটা করল বাপি। তার বাইক তখন ২০ কিমি বেগে ধর্মতলা শাসন করছে। উত্তরে লাভলি বলল।

"হ্যাঁ, করাব তো একটা। ক্লিভেজের ঠিক উপরে। সামনের মাসে।"

বাপি মন আর মুঠো টাইট না করলে বাইকটা তক্ষুনি একটা মিনিবাসের পিছনে গোঁত্তা মারত।

"ও। আচ্ছা।"

নিয়ম হচ্ছে যেখান থেকে পিক আপ, সেখানেই ড্রপ। পাড়ার মধ্যে বাইকে করে দু'জন ঘুরবে না। তারা অফিশিয়ালি লাভার না হলেও, লাভলি কোনও গসিপ চায় না। তাই ব্যাঙ্গুর ডায়মন্ড হারবার রোডে বাপির ঝিমন্ত বাইক থেকে নেমে দাঁড়িয়ে লাভলি হাত নেড়ে বলল, "বাই।"

"একটা কথা বলব?"

বাপি স্পষ্ট বুঝতে পারছে যে ওই লাল আলো তাকে হেবি সাহস যাইয়ে দিয়েছে।

"বলো, কুইক।"

"একনিন কিস যাব।"

একটা হাফভলি সাম্লাটা, তারপর লাভলির হাসিমাখা বিস্ময়।

"হোয়াট?"

"শুনলেই তো, যা বললাম। কিস যাবো একটা।"

"তাই? অত সোজা?"

"তোমাকে না তো।"

"ওহ, আচ্ছা। তা কাকে?"

"ওই পিক্তলগুলা হরিণটাকে," বলেই বাপি ফোর্থ গিয়ারে ইউ টার্ন।

বাপি আর উত্তেজনায় পিছন ফিরে তাকাল না। তাকালে দেখতে পেত, লাভলি খুবে মোটেই। বরং জিভ নিয়ে এট্টু লিপ গ্লস চেটে নিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠছে, "নট ব্যাড..."

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই ইভিনিং। কিন্তু কী আশ্চর্য, বহুদিন হরে বিলিতি বোস যেয়াল করছেন, দশ মাইলের মধ্যে কোথাও বাঘের নামগন্ধ নেই, কিন্তু সঙ্কে হবেই হবে। আজও মেঘন রায়পাড়ার একতলা-দোতলা বাড়িগুলোর টালি আর ছাদ ছুঁয়ে সঙ্কে একটা ল্যান্ডিং নিয়ে রায়ঘ।

বিকেল-বিকেল গভীরভাবে ঘিঞ্চিং হয়ে পড়েছিলেন তিনি। শাকরেদ টফিকে নিয়ে ব্যাপারটা সরেজমিনে দেখবেন বলেও ভেবেছিলেন, কিন্তু পথে নেমে জাস্ট কোনও স্ক্র্যাপ পেলেন না। টিপ পাড়ার মোড়ে ক্যারম পেটাতে চলে যাবার পর বাড়ি ফুলেনেই। এক কামরার ঠেক। ঠেকনাও বলা চলে। কোনও রকমে জোর করে আড্ডার কাজার হয়ে আছেন। ওয়ান অ্যান এজেন্ট, অলগুয়েজ আ সাফারার।

এহেন বিলিতি বাড়িতেও খুব সিম্পিল আর সহজ একটা লাইফ মেনটেন করেন। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস তাঁর বাড়িতে এক পিসও নেই। রান্না মাঝেমধ্যে বিলিতি নিজেই করেন, বাকি সময়টা পাড়ার সর্বরিজি মিনিখাবা থেকে রুটি-তড়কা। আজও তেমনই একটা সন্ধে। রুটি-তড়কার লবেজান প্যাকেটটা নিয়ে ঢুকতেই একটা হেভি জিনিস বিলিতি বডিতে ঠোকর মেল। অন্ধকার। টোটাল অন্ধকার। তাঁর যেয়াল হল, গত মাসের বিল মেটানো হয়নি বলে শালারা লাইন কেটে দিয়ে গিয়েছে। ইন ফ্যাক্ট, তাতে ভালই হয়েছে। মেঘনে আলোয় মাথাটা ওয়ার্ক করে ভাল। মালপত্তর নামিয়ে চাংড়া মোমবাতিটা জ্বেলে মানুহেই সিটি নিলেন বিলিতি বোস। পকেট থেকে টাবলেট ভলকার পীইটটা বের করে সামনে রাখতেই খুব ভালো হয়ে গেল। এটা তাঁর ডেলিঙ্কার ডেলি ব্যাপার। সঙ্কে হলে লেবু জল মেরে এট্টু ভলকা না লাগালে মাথা ব্যাক করতে চায় না। রাশিয়ার ড্রিঙ্ক যে বাংলায় এত ভাল কাজে লেগে যে কী করে, ভেবে স্ট্রেঞ্জ হয়ে যান তিনি।

আপাতত তিনি সামান্য ভোলা আমরে টাক করে একটা ঢোক মেরে দিলেন। ভিতরটা স্ক্রেপ হয়ে গেল বটে, কিন্তু যে ভাবনা পাচ্ছিলেন, সেটাই হল। জেসমিনকে মেন পড়ল। হাতে কাজ না থাকলে বেব্বার মেমারি বড় জ্বালায়। গত কয়েকদিন হতে সেটাই হচ্ছে। জেসমিনকে টপাটপ মনে পড়ছে। ব্লক করতে পারছেন না। মনটা যে কেন শালা ফেসবুক নয়, কে জানে।

বিলিতি দেখতে পেলেন, তিনি বঁধ প্রিন্ট বড় কলারের ফুল শার্ট পরে মিনতিমায় হলের সামনে টিকিট ব্ল্যাক করছেন। মারমার কাণ্ড, মিনা রায়-টিমা রায় যমজ হিরোইনের নতুন হিন্দি বই লেগেছে, 'তেরে লিয়ে মেরে'। ছেলেদের একটা গাল্পিগলহই ভিড় সেই সকাল থেকে হলের বাইরে পাক খাচ্ছে। হেবি টিকিট ব্ল্যাক হচ্ছে, তারই মধ্যে রিক্সা থেকে চুপচাপ সালোয়ার পরা একটা মেয়ে নামল। নামল মানে মাটিতে পা-ফা রাখল আর কী। কাঁধে ব্যাগ, ভিতর থেকে বই আর চিরুনির কানা উঁকি লাগাচ্ছে।

যুবক বিলিতি ডিরেক্ট ফ্রিজ করে গেল। মেয়েটা আসছে। কোমর অব্দি খুলে রাখা হেয়ারে এয়ার খেলা করছে। গায়ের রং কাঁচা রাউন, গিলার কোনও চুপ্পুল যাকে বলে। চওড়া ঠোঁটে না লিপস্টিক, তাইতেই কী মাগনাম্যাজেন্টা রং ধরেছে সে বাবা! বিলিতি যদি না নড়ে, আর মেয়েটা যদি না তাকায়, একটা স্লেট টেকউনিক কেছা কেউ আটকাতে পারবে না।

হলও তাই। মেয়েটা আনমনা মোড় থেকে বেরোতে না বেরোতেই মিহি কলিশন। একে বুক, হাঁটুতে হাঁটু। এই প্রথম কোনও মেয়ের বুকের ফিল পেল বিলিতি। এমন হয়? এইরকম নরম? যেন কেউ ময়দা আর তুলোমুল একসঙ্গে মাখিয়ে রেখেছে...স্ট্রোক-কোক হয়ে মরেই যেত সেদিন বিলিতি, যদি না ধাক্কার চোটে মেয়েটার ব্যাগ আর তার হাতের বাকি টিকিটগুলো ছিটকে রাস্তায় পড়ে যেত। বিলিতি সরি বলার আগেই মেয়েটা তার দিয়ামান্ড হাসির ঝাপটা মেরে বলল, 'সরি'। বিলিতি বুঝল, সে আর নেই। মোমেন্টের মধ্যে সে নিজেকে এই মেয়েটার হাওয়ালে করে দিয়ে নিজে টসকে গেছে। ফুল কেস যাকে বলে।

মোমবাতির আলোয় টুসি হয়ে যাওয়া ঘরের কোণে ভলকায় আর-একটা লং মুমুক লাগাতেই বিলিতি বোসের মনে পড়ল, ওই ধাক্কার পরমুহূর্তেই, যা নাকি তখন মনে হয়েছিল মিনিমাম বারো বছর লম্বা, দু'জনেই হাঁটু ভাঁজ করে মুখোমুখি মাটিতে বসে পড়েছিলেন। গোটা ব্যাপারটা ফ্রেম বাই ফ্রেম মনে আছে বিলিতি বোসের। সাদা চাপা সালোয়ার পরা সেই মেয়ে তখন বইপত্তর কুড়োচ্ছে, আর চোখ তুলে বিলিতি বোসের দিকে চিনিচাউনি দিচ্ছে।

শেষ বইটা যখন কুড়িয়ে নিচ্ছে সে, তখনই দেখা গেল তার কলেজের আই কার্ড। তার মধ্যে সেকেন্ড ইয়ার কথাটা পড়তে পারল ঝাপসা হয়ে যাওয়া বিলিতি, আর পড়তে পারল এক বলে তিনটে উইকেট ফেলে দেওয়া সেই রূপসীর নাম। সাহিত্য রুক জেসমিন। উফফফ! নামটা চোখে পড়তেই ফুলের টোসকায় প্রায় অজ্ঞান হবার জোগাড় বিলিতির। এই না হলে নাম? ওই মাটিতে বসে-বসেই বার-দুয়েক নামটা মনে-মনে আউড়ে দেখল বিলিতি।

নামের হিপনো থেকে বেরিয়ে টিকিটহারা বিলিতি যেয়াল করল, মেয়েটা হেঁটে মিনিমে যাচ্ছে দূরে, ভিড়কে ইলেকট্রিফাই করে। পৃথিবীতে তার তখন একটাই পবিত্র ডিউটি। জাস্ট ফলো। যেটা বুঝল বিলিতি, এ অঞ্চলেই মেয়েটার বাড়ি। কারণ মিনিমায় হলের পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে কোনও দিকে কোনও কলেজ নেই, থাকলে লাট উঠত। ফলো চলল মিনিট তিনেক, যেটাকে কমসে কম পাঁচ বছরের ট্রিপ বলে মনে হল বিলিতির। থামল শেষে এলাকার বিখ্যাত লেডিজ হস্টেল 'গোলাপি গার্লস'-এর সামনে। মিনতিমায় হল-এর পর ছেলেদের কাছে এই হস্টেলের টিআরপি সবচাইতে বেশি। যারা মনিং শো টিকিট পায় না, তারা গোলাপি গার্লস-এর সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বন্ধ করে নামটা আরও একবার জপে নিয়ে চোখ খুলেন করতেই বিলিতি দেখল, জেসমিন ক্যাডাক সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় মিলিয়ে গেল। আচ্ছা। তারলে এই কেসা। একদিক থেকে ভালা। বাবা-মা-দাদার সমস্যা নেই, ডিরেক্ট আঁখো আঁখো মে হয়ে যাবে।

কিন্তু বিলিতি তখনও জানত না, তার জিন্দেগি অনেক রাফ অ্যান্ড টাফ দুঃখ নিয়ে ওয়েট করছে। পরদিন একটা চারআনার লাল গোলাপ হাতে, চান-ফান সেরে, লবঙ্গ মাজন দিয়ে দু'বার দাঁত মেজে 'গোলাপি গার্লস'-এর সামনে গিয়ে যখন দাঁড়াল বিলিতি, তখন যার কথা রিস্ট ওয়াচ বলছে সাড়ে ন'টা। এইবার একধারসে পরিদের বাঁক কলেজ যাওয়ার জন্যে এ দরজা-সে দরজা থেকে ডেড় বেরোবে। তারই মধ্যে একজন বংরে জেসমিন, যাকে মাবপণ্যে ল্যান্ডিং মারিয়ে বিলিতি বলবেই বলবে সেই কথাটি। আই লাভ ইউ। তুমি কি লাভ মি? ব্যাস। কিন্তু হল কী, গুনে-গুনে তেইশজন রূপসী একজিট নিল, জেসমিনের কোনও পাত্তা নেই। টিকাছে, ভাবল বিলিতি, স্টারেরা লাস্ট এন্ট্রি নেয় চিরকাল। কিন্তু আরও দু'জন হেসেখেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর ব্যাপারটা তার শুভ ঠেকল না। সে অগত্যা গোলাপটা হিপ পকেটে ফিক্স করে পরের জনকে গিয়ে ধরল,

"আচ্ছা, মানে, জেসমিন কি এখানে থাকে?"

"জেসমিন?...আপনি কে?"

"আমি...আমি মানে ওর ছোটবেলার বন্ধু ও বলেছিল এই ঠিকানায় থাকে, তাই আর কী..."

"ঠিকই বলেছিল। কিন্তু আর থাকে না।"

"থাকে না?"

প্রশ্নটা করতে-করতেই খেলানো চুলের মাথায় একটা মিনিবাজের আঘাত সহ্য করে নিল বিলিতি। তবে যে সে শতকানই দুপুরে স্কেল সিঁড়ি দিয়ে সেই ডেডলি উঠে যাওয়া? সে কি মিথ্যে?

"না থাকে না। কাল সন্ধেবেলা হস্টেল ছেড়ে দিয়েছে।"

বলেই মেয়েটি হনহন লাগান রিক্সা স্ট্যান্ডকে নিশানা করে। বিলিতির জান ওমন থই মেয়েটার হাফবাব্যে আটকে হাঁসফাঁস করছে। সে দ্রুত পায়ে ফিচিং লাগান।

"ইয়ে, মানে...কেন, ছেড়ে দিল?"

"তিনমাসের ভাড়া বাকি ছিল, খুব খামেলা হয়েছে।"

"অ। কখন গেল?"

"সন্ধেবেলা। আমরা ছিলাম না তখন। থাকলে কি আর...রিকশা..."

"কোথায়...মানে কোথায় যেতে চাইছে খি..."

"জানি না।"

মেয়েটা মিলিয়ে গেল। পাশেই ছিল চায়ের দোকান, ধপ করে সেখানেই বডি ফেলল ভেঙে পড়া বিলিতি। হায় হায়। এই যদি কপালে ছিল, তাহলে কাল গুরুকম মিনিংফুল দেখাই বা হল কেন? মনের টাওয়ারে একটা সিংহাসন পেতে রেখে হাওয়া হয়ে গেল সে? সাহিরা হক জেসমিন! আহা। সাহিরা হক জেসমিন! বিলিতির চোখেও তখন চায়ের জল ফুটছে। কড়া লিকার হয়ে যাবে।

সেই দিন, আর আজকের দিন। সেই দেখা, আর আজকের মোমবাতি। বিলিতি সেই থেকে টোটাল লোনলি হয়ে আছেন। মন তো মন, এমনকী শরীলও কাউকে দিতে পারেননি আর।

অন্ধকারের মধ্যে বেশ একটা টাইম ট্র্যাভেল মেরে নিজের ঘরে আবার ফিরে এলেন বিলি। আজ মিস্টোর তেমন আর পাচ্ছে না। ছোলা দিয়ে ডলকা, আর ঝুডি। এতেই পেট ভরে টিপ। ভাবলেন আরও একবার জেসমিনের নামটা একটু আওয়াজ দিয়ে উচ্চারণ করেই বডি বাবেনে মারুবে, কিন্তু হল না। কারণ মোমবাতির আলোতেই টিনি দেখতে পেলেন, ঘরের সদর ডোরের সামনে একটা ভাঁজ করা চিরকুট পড়ে আছে। নেশার ঘোরেই ক্রিয়ার মনে করতে পারলেন তিনি, সকালে যখন বেরেছেন, তখন এ জিনিস এখানে ছিল না। মানে খুব ডেঞ্জারাস, বিকেল নাগাদ কেউ একটা লপ্তার তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গিয়েছে। এক মোমেন্টে টোটাল সাবধান হয়ে গেলেন বিলিতি বোস। প্রেমিক থেকে সটান এক্সেন্ট বাড়িতে অন্তু বলতে সেসপানা, না-মাঙ্গা। বেসিন থেকে সেটাকেই হাতে তুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। এক্সেন্টদের জীবন খুব ডেঞ্জারঘন ব্যাপার, সেটা জেনেই তিনি এ লাইনে এসেছেন। কিন্তু জেসমিনকে আর একবার অন্তত সামনে থেকে না দেখে ফুটে যেতে মন না।

কিছুক্ষণ ঘইভাবে ওয়েট করার পর যখন বুঝলেন এগোনো যায়, টিপিটিপি পায়ে গিয়ে চিরকুটটা তুলে নিলেন বিলিতি। মোমবাতির আলোয় ঠাহর হচ্ছিল না ঠিকই, কিন্তু ভয়ের কিচ্ছু নেই। এ চিরকুটের কাগজ আর কায়দা তাঁর বিলকুল চেনা। কোথা থেকে এসেছে তাও তিনি জানেন। কেবল জানেন না এই যে, ভেতরের রাইটিংটা কী আছে।

চ্যাংড়া মোমটাকে কাঁপা হাতে তুলে আর-এক হাত দিয়ে চিরকুটটা গুণেন মারলেন বিলিতি বোস। এক ন্যানো সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর ঠোঁটের কোণে যে হাসিটা ফুটে উঠল, সত্রেতিস মাখে-মধ্যে সেই হাসিটা হাসতেন।

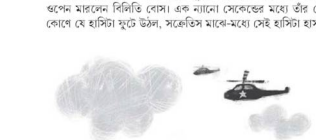

টনির ঠিক অপোজিটে যেলছে হারু। এ পাড়ার ক্যারমকেরামতি এবং সর্বোপরি চৌধুরি সুইট-এর আন্ডু চৌধুরীর গুনিল ছেলে। এক্কেবারে টনির্রই বয়সি, কিন্তু ক্যারমের হাত কপিল দেবের মতো। তাই হারু যে-টিমে থাকবে, সেই টিমকে হারানো প্রায় নামুমকিন। এখন হারুর নজর আটকে আছে তিনটে ঘুটির মাঝখানে ফেঁসে থাকা মেরুন রানির দিকে। একটু টাইম নিচ্ছে হারু। ফ্রি কিকের আগে ফুটবলার যেমন নেয়, আর সেই সুযোগেই তাকে দু'চোখ ভরে ঝাড়ি মারছে টনি। দো ঘুটিমার ফুলস্ত লাইট তার মুখে পড়েনি, নইলে তার চাউনি দেখে হারুর টপ টসকে যেত।

এখানে একটা গোটা নভেল লেখা যখন হচ্ছেই, তখন লুকোছাপা করে লাভ নেই, টনি দে মনে-মনে হারুকে চায়। শরীলেও চায়, সেটা দূরের ব্যাপার। ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের তার ভাল্লাগে না, ছেলেদের দিকেই তার নজর। ইংরেজিতে যাকে বলে গে, বাংলায় সমকামী। টনি দে হল ভাই। তাতে তার কোনও দুঃখ নেই, কেবল মা জানতে পারলে এই বয়সে কষ্ট করে সুইসাইডের ট্রাই নেবে, এইটা ভাবলেই তার বুকটা কেঁপে ওঠে। আর-একটা কথা ভাবলেও ইকুয়াল কাঁপে, সেটা হল এই যে, হারু যদি তাকে না চায়? মানে, সে যদি গে না হয়? তাহলে? যদিও হারুর হাবেভাবে চলায় বলায় ফলো লাগিয়ে টিনি দে-র ক্রিয়ার বিশ্বাস যে, হারুও ছেলেদের প্রতি টাচু তবে বিনাশ, এসব কেস ফেলে রাখতে নেই। তবে হ্যাঁ, পাড়ার কী রি-অ্যাকশন হবে, সেটা ভাবলে টনির হাড় আইসক্রিম পাকিয়ে যায়। সে ভ্রিক করে, তার আর হারুর একটা গোপন আন্ডানা থাকবে, এই পাড়ার বাইরে কোথাও।

টকাং। টনির স্বপ্নে টোকা দিয়ে ফালি পকেটে ফেলল হারু। তার ঘেমো মুখে তখন স্ক্যালোনের হাসি। সেই হাসি দেখেই টনি দে ডিজাইড করল, আজ বাড়ি ফেরতা পথে হারুকে মনের কথা জানাতে হবে। তারপর যা হওয়ার হোক।

বিহাতার শ্ল্যানিং অনুযায়ী হারু আর টনি দে-র বাড়ি একই লাইনে। পাড়ার বিয়পাল দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে যখন পাশাপাশি ফিরছে দুজন, টনি দে সম্পূর্ণ অন্য লাইনে কথা টানল।

"তুই কী ভাবছিস, মিষ্টির লাইনে যাবি?"

এই বয়েসটায় কোলেজ কেরিয়ার নিয়ে কেলেঙ্কারি মাতায়, তাই এটাই কথা বলার সেফ লাইন।

"না রে, ওসব মিষ্টি ফিস্টি আমার জন্যে না। আমি অন্য কাজে এসেছি।"

"কোথায় এসেছিস?"

"এই ওয়ার্ল্ডে।"

"ওহ, তাই বল। ভেবেছিস কিছু, কেরিয়ার নিয়ে?"

"হ্যাঁ রে, সারাতে হবে। দেখি, কাল বিশুদার দোকানে নিয়ে যাব একবার।"

"ধুত, সাইকেলের না। তোর নিজের কেরিয়ার।"

"ওহ, তাই বল। হ্যাঁ, ছেট থেকেই জানাত রে। ক্যারাম খেলব।"

"সে তো এখন। পরে কী করবি?"

"মানেং সচিন তো ছেট থেকে এখন পর্যন্ত ব্যাটই করে গেল। তাহলে?"

"ও, সেইরকম সিচুয়েশন। আচ্ছা। কিন্তু মানে, ক্যারাম কি বাইরে, মানে..."

"অলিম্পিকে হয়তো নেই, কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল খেলা হয়, প্রাইজ মানি হেবি। খবর রাখিস কিছু?"

তা ঠিক, নানা বেকারত্ব আর যৌবন সামলাতে গিয়ে ক্যারাম বিষয়ে নিজেকে আপডেট করে উঠতে পড়েনি টনি দে। যারাপই লাগল তার। তবে কিনা, বুকে বল নিয়ে একবার যখন স্যার্টাই মেরেছে টিপ, তখন সে অনেক দূর দেখে তবে ছাড়বে বলেই দেখাতে হচ্ছে আর কী। সে কথা থামান না।

"তা রাখা হয় না ঠিকই। সারি। কিন্তু ক্যারাম হেবি সেক্সি খেলা।"

"যাহ সালা। খেলা আবার সেক্সি কী রে? কী যে বলিস সব মাঝেমাঝে..."

"ও তুই বুঝবি না। আচ্ছা হারু, তোর অ্যাসেয়ার-ট্যাসেয়ার নেই? মানে, এমনি বলছি আর কী।"

কথাটা বলামাত্র, টনি দে কে টোটাল অবাক লাগিয়ে দিয়ে তার দু'হাত ধরে ঠোঁট টিপে লিকুকান্না কেঁদে উঠল হারু। টনি আর কিছু বুঝুক না বুঝুক এইটা ঠিকই বুঝল যে সে ডিরেক্ট মৌচাকে বুলেট লাগিয়েছে।

"আই অ্যাই, কী রে, কাঁদছিস কেন হারু? হল কী? আরে এই ন্যাখো..."

হারু কেঁদে উঠলে টনি দে-র বরমপানা বুকের বাঁদিকটাও টাটিয়ে ওঠে আর কী। সে একটা হাত হারুর মাথায় রাখতেই হারুর কান্নার ফোর্স বেড়ে গেল।

"কী হয়েছে তুই বল আমাকে? আমি কাউকে বলব না। মান্নালি।"

হারু চোখের জল হাতের চেটোয় পাপ্পিং করে নিয়ে জবাব দিল, "আমি নর্মালি না রে টনি, আমি নর্মাল না। আ হা হা হা।" শেষকিটা কান্নায় ফেড আউট হল। রেয়ার মোমেন্ট। যে-উত্তর শুনে টনি দে-র তুমুল খুশি হওয়ার কথা, সেটা বলতে-বলতেই যোগ তার লাভার বরবর করে কেঁদে ভাসাচ্ছে। টনি এই পয়েন্টটা নিয়ে আর-একটু খোঁচাল।

"নমলি না...মানে কী রে?"

"হুত! তুই সানা কিচ্ছু বুঝিস না। আমার মেয়ে দেখলে দাঁড়ায় না আ আ হা হা..."

আবার শেষ দিকটা কান্নায় ঝাপসা। টফির মনে একটা ঘুঘু বেড়াল লাফ মাচ্ছে অঘঃ।

"ও ও! আচ্ছা। তাহলে?"

এই সেই মোক্ষম কোশ্চেন যার পরে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায় সানরাইজ তুড়ি লাগাবে। হলও তাই।

"আমি ছেলেদের ভালবাসি। আমি সমকামী হ ই হি হি। টফি রে এ এ হে হে ..."

টফি আনন্দে কুইনাইন হয়ে উঠে দু'হাত দিয়ে তার মেন্টাল লাভার, মানে হারুকে টেনে জড়িয়ে ধরল।

"কাঁদিস না হারু। আমি আছি।"

"তুই থেকে আমার কী হবে। তুই বুঝবি না আমার অবস্থা..."

"বুঝব।"

"বুঝবি?"

"বুঝব। আমিও তো।"

"তুইও মানে?"

"মানেও আমিও ওই।"

"অ্যাঁ?"

"হ্যাঁ রে। আর আমি...মানে আমি তোকে অনেকদিন থেকে...মানে..."

এর বেশি আর কিছুই বলে উঠতে পারল না টফি, কারণ তাকে টোটাল চমকে দিয়ে তার ঠোঁটের মধ্যে নিজের ঠোঁট গুঁজে দিয়ে প্রবল সাকশান শুরু করেছে হারু। হারুর চোখ বন্ধ এবং ভিতর থেকে নিশ্চিন্ত। সে দেখে গিয়েছে। টফির চোখ টানটান এবং বিস্ফিত। সে যে পাবে এটা ভাবেইনি। সে কিছু বোঝার আগেই হারু জিভ দিয়ে তার ভিতর থেকে সব ভয়, অভিমান, পরাজয় শুষে নিচ্ছে। চুষে নিচ্ছে। একটা চামচিকে কেবল এই সিন দেখে ফেলল, কিচ্ছু বুঝল না।

বিকেলে ব্যাক করে গেলেই আমরা আজ্ঞাদ করতে পারব, মগ্ন সেতারি সঞ্জয় সোম দরজা খুলে স্ট্যাচু মেরে গেলেন ঠিক কী কারণে। কারণ আর কিছুই না, এম্বার্ত ঘেমে-নেয়ে প্রেম বিরহিণ যেস নিয়ে তাঁর দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া স্ত্রী, অনিমা সোম। অবিশ্যি তিনি এখন সঞ্জয় সোমের টাইটেল ইউজ় করছেন কি না, সেটা জানা নেই।

মোমেন্টের জন্যে অবাক হলেও, পুরনো ভাল লাগায় ভরে উঠল সঞ্জয় সোমের মন। বউটাকে তিনি ঠিন টু বাটাম ভালবাসতেন। কিন্তু এই মায়ার সাসার আর্টিস্টের জন্য না। ঠিকই করেছে। ছেড়ে গিয়ে ঠিকই করেছে। নিজের জীবন নিউলি শুরু করতে পারবে। ইন ফ্যাক্ট, লোকমুখে শুনেছেন সঞ্জয় সোম, অনিমা বোধহয় আবার...

"আরে আরে, ভিতরে এসো। আগে বলতে হয় তো..."

"কেন? না বলে এ বাড়িতে আর আসতে পারি না বুঝি?"

অনিমার গলায় ৪৩ ডিগ্রির গরম অভিমান। খুশিই হলেন সঞ্জয়।

"হাজারবার পারো। এটা এখনও তোমার বাড়ি। সব সময় তোমারই থাকবে। তেতলার ঘরে বসি?"

"নাহ্ থাক। এখানেই হবে।"

"হবে মানে? কী হবে?"

"বেশিক্ষণ নেবো না, কয়েকটা সই লাগবে। আমিও বেরোব, কাজ আছে অনেক।"

"সই?"

"হ্যাঁ। সিগনেচার। অটোগ্রাফ নয়।"

ব্যাপারটা ক্যাপচার করতে পারলেন না সঞ্জয় সোম।

"মানে বুঝলাম না ঠিক।"

"বোঝো না বলেই এই হয়রানিটা হল আমার। এটা চিনতে পারছ?"

ব্যাগ থেকে ভাঁজ করা একটা লম্বাপানা পেপার বের করে সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে দিলেন তনিমা। লাইট সবজে কালারের। দেখে তো কাগজটা চেনা-চেনাই মনে হচ্ছে। খুলে দেখলেন, ঠিকই। এটা তাঁদের নিজেদেরই ডিভোর্স পেপার।

"অ। তা এটা আবার কেন? এটা তো আমি সই করে দিয়েছি।"

"সই করোনি, অটোগ্রাফ দিয়েছ। উল্টে দ্যাখো একবার। আগে জানলে আমি নিজে বসে করিয়ে নিয়ে যেতাম। একটা কাজ যদি..."

অনিমার নমলি গজগজ ক্রস করে বুটো পাতা উল্টে দেখলেন সঞ্জয় সোম। সিগনেচারের জায়গায় লেখা আছে

'মে লাইফ বি উইথ ইউ। উইথ বেস্ট উইশেজ়, সঞ্জয় সোম।'

"ওহো। একটু বড় হয়ে গিয়েছে, না?"

"বুঝেছ? অসাধারণ! এবার নতুন করে সই করে দাও, কাগজ এনেছি। সই করবে। সই। অটোগ্রাফ দিতে হবে না।"

সঞ্জয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সই দেওয়ার জন্যে তাঁর বার্থ হয়নি, এ তিনি ভালই জানেন। বিভিন্ন সাইজ় ও কালারের পেপারে অটোগ্রাফ দিতে দিতে তাঁর এগিয়ে চলার পথ সেজে উঠবে, এই ছিল ধারণা। কিন্তু ওয়ার্ল্ড তাঁকে বোঝেনি। সেই আকুল তেইা ডিভোর্স পেপারের উপর দিয়ে চালাতে গিয়েই আঙ্গ ঝাড়ো মেয়ে গেলেন। যাক্কে যাক, এখন আর টেন্সিরি বাড়িয়ে লাভ নেই, বেচারির ঘামে ভেজা মুখটা দেখে স্যাডই লাগছে সঞ্জয় সোমের।

"দাও, নতুন কপিতে তো।"

"হ্যাঁ, ওভারহাইটি চলবে না," বলে কাঁধের বড় ব্যাগ থেকে ঠিক একই রকম আর-একগোছা পেপার বের করে সঞ্জয় সোমের দিকে এগিয়ে দিলেন অনিমা। সঞ্জয় পাতা উল্টে সাধারণ পিপুলের মতো জাস্ট সই দিয়ে গেলেন। এতগুলো পাতাকে বক্তিক করতে তাঁর ভাল লাগছিল না বলিঃ

কিন্তু সই দিতে-দিতেই তিনি খেয়াল করলেন, অনিমার টাউস ব্যাগের কনরি থেকে আরও একটা একই রকমের কাগজ উঁকি মারছে। কৌতূহল অবতারদেরও টাইট নেয়, আটিস্ট কোন ছাড়া।

"ইয়ে, মানে, শরবত খাবে, একটু?"

"শরবত? আমি ফেল যাওয়ার পর নতুন কিনেছ?"

"না মানে, ওইটাই আছে আর কী।"

"খাবো না। জুন মাসে এক্সপারিয়ি পেরিয়ে গিয়েছে। সই হল?"

"এতগুলো তো, টাইম লাগছে। বলছিলাম যে, ওটা কী? আর-একটা কপি নাকি?"

অনিমা বরাবরই স্মার্ট, সত্যিটা বলতে একটুও সময় নিলেন না।

"ওটা আরেকটা ডিভোর্স পেপার। আমার পরের হাজব্যান্ডের সঙ্গে।"

সঞ্জয় সোম সই দিতে-দিতে থমকে আটান।

"মানে?"

"মানেটা খুব সিম্পল। তোমার সঙ্গে ডিভোর্স না হলে তো আরেকটা বিয়ে করতে পারি না টেকনিক্যালি, কিন্তু একজনকে মনে ধরেছিল। তারও ধরেছিল। বঁকুড়ার নিমশিবেশ্বর মন্দিরে পুজো দিয়ে বিয়ে করে আমরা ছ'মাস আগে থেকে একসঙ্গে থাকতে শুরু করি। আর দু'দিন পরই বুঝতে পারি, এর সঙ্গেও আমার থাকা হবে না। পপপর দু'বার একই ভুল করলাম। যাই হোক, আসছে নভেম্বরে আমাদের অফিশিয়াল বিয়ে, কার্ড-টার্ড ছাপা হয়ে গিয়েছে, এখন কেঁচিয়ে গেলে খুব বিশ্রী হবে। তাই বিয়েটা করেই ফেলছি, কিন্তু তার পরেই ডিভোর্স দেব। এটা তারই ড্রাফট। কোর্টে গিয়েছিলাম যখন, একসঙ্গে করিয়ে রাখলাম।"

"এসব তুমি কী বলছ অনিমা? তুমি শেষমেশ লিভটু..."

"গেলাব! হ্যাঁ। তাতে দোষ নেই তো। আমাদের সেপারেশন সেই কবে হয়ে গিয়েছে। তোমার অটোগ্রাফের পাগলামো না থাকলে ডিভোর্সও হয়ে যেত।"

"আর ভালবাসা? সেটা কি কিছু নয়?"

কথাটা বলেই সঞ্জয় সোমের মনে পড়ল, ১৯৮৩-তে চপলা সিনেমায় একটা বাংলা বই দেখেছিলেন, 'মন্দিরে মা, মনে তুমি'। শেষ দৃশ্যের জাস্ট আগে হিরো এই ডায়ালগটা ঝেড়েছিল। তাতে অবশ্য হিরোইন কেঁদে ভার বুকে ডাছিঘ মারে, এক্ষেত্রে উল্টোটা হল। অনিমা বললেন, "কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, সইগুলো করে দাও, আসি।"

"সে নয় দিচ্ছি। কিন্তু এটুকু জানার রাইট কি আমার নেই যে কাকে তুমি বিয়ে করলে, আর কেনই বা ডিভোর্স দিচ্ছ?"

"রাইট অনেক বড় ব্যাপার, তবে তুমি এমনিই জানতে পারো। নাম, মুখার শীল। বয়েসে তোমার চেয়ে কিছু ছোট হবে, একটা বেসরকারি ফার্মে ইঞ্জিনিয়ার, গল্ফস গ্রিন-এ পরুণ ফ্ল্যাট, আর আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে।"

"আচ্ছা। ওকে। তাহলে? সবই তো ঠিকঠাক মনে হচ্ছে।"

"ঠিকঠাকের চেয়ে অনেকটা বেশিই সবকিছু থেকে।"

"শুনে তো আমারও তাই মনে হচ্ছে। তাহলে যামোকা ডিভোর্স কেন? আমি চাই তুমি সুখী হও।"

লাস্টের কথাটা কোন বাংলা বই থেকে, সেটা এক্ষুনি মনে পড়ল না সঞ্জয় সোমের, কিন্তু কথাটা ইম্পর্ট্যান্ট।

"তুমি চাও কি না আমার জেনে আর কাজ নেই, আমি নিজে চাই সুখী হতে, কিন্তু এতবিঘুর পরেও মৃণালের কাছে সুখ পেলাম না।"

"কেন অনিমা? কেন?"

"কেননা মৃণাল তবলা বাজায়।"

ঘরে একটা সাড়ে পনেরো কিলো গুজনের নীরবতা। মেনলি সঞ্জয় সোমের দিক থেকে। সেটা ইমিডিয়েটলি না বুঝতে পেরে অনিমাই নিজের ফোডের কথা বলে চললেন।

"আমার কপালে সুখ নেই, সেটা আমি বুঝে গিয়েছি। একটা মানুষ, যার কোনও দিকে কোনও খামতি নেই। ভাল রোজগার, একটা ফ্ল্যাট, নতুন গাড়ি, বাড়িতে আর কেউ নেই, দারুণ দিগার, এমনকী, বলতে আমার বাধা নেই, গুইসবেশু এত...কিন্তু এই একটা দোষের জন্য...আমি আর ভাবতে পারি না..."

হালকার উপর লাইট করে কিছুটা ভেঙেই পড়লেন অনিমা। এক্ষুনি তাঁর ঘেমো কাঁধে হাত দেওয়াটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে না পেরে সঞ্জয় সোম বিশেষ এগোলেন না। জাস্ট একটা সরল কোশ্চেন রাখলেন, "কিন্তু তবলা বাজানোটা দোষের হবে কেন অনিমা? সে তো একটা গুণ। এ তো ভাল ব্যাপার যে এত কিছু সামলে সে তবলাকে..."

"জাস্ট চুপ। চুপ করো। তবলার সাপোর্টে একটা কথাও আমি তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। রাত আড়াইটে নাগাদ তুখোড় সেক্সের পর বাকি রাতটা এলোপাথাড়ি বীইহমাস শুনতে কেমন লাগে সেটা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বোঝাব এখন?"

সেক্সের কথাটা ডিরেক্ট অনিমার মুখ থেকে শুনে সঞ্জয় সোম হালকা একটা বেদনা দিল করলেন। বুকে নয়। সেটা সামলে তিনি খুব ফোকাসড একটা প্রশ্ন ঝাড়লেন,

"কোন ঘরানা?"

"ভাল জানি না। ফারাক্কা না হানবাব কী একটা বলেছিল।"

"সারকাবাব! খুব টাফ ঘরানা। সবার সুট করে না।"

"আমার তো ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক ব্যাপারটাই অসহ্য লাগছে। কেন যে মরতে..."

"রবীন্দ্রসংগীতে কেউ চেনা নেই?"

অনিমার মনে জোর জোগাতেই কোশ্চেনটা করেছিলেন সঞ্জয়, কিন্তু তার চাউনি দেখে কথা না বাড়িয়ে বাকি পাওাগুলোয় দ্নানব সই মেরে দিলেন। অনিমা জাস্ট 'আসি' বলে সন্ধের ট্রাল্লি খাওয়া রায়পাড়ায় বেঝেরা অন্ধকারের মতো মিশে গেল।

শিল্পীদের সহজে ভেঙে পড়লে হয় না। বুকের কাছে আটকে থাকা একটা দীর্ঘশ্বাসকে বাইপাস করে টহেত ঘরে গিয়ে সেতারটা নিয়ে সিটিং নিলেন সঞ্জয় সোম। ৩৯ ডিগ্রির গরমেও কোলে শাল পেলে প্রথম নিবিড় ডীাঙ লাগালেন। রাগ চিল কেদার। স্লাইড কড়া। ছাদের মাথায় একটা কাঠবেড়ালি জিমন্যাস্টিকস শানাচ্ছিল, রাগের চলনে তার পদস্খলন হল মোমেন্টে।

তিলু রায় রাতে বড় একটা ঘুমোন না। তাঁর বিলিফ, রাতেই ব্যবসা বাড়ে। তাই রাত জেগে আরও কী-কী ভাবে ব্যবসা বাড়িয়ে একেবারে নার্গোথিং হয়ে ওঠা যায়, সেই স্ল্যান করেন। বিশাল বাড়ির লোতলায় নিজের একটা চেম্বার আছে, সাউন্ডপ্রুফ। সেখানেই নানাবিধ স্ল্যানিং মেতে রাতটা কাটান তিলু রায়। অবশ্য একা নন, সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারি মায়ন খাকে। সোনার ব্যবসায় ফেমাস মারার পর তিলু রায়ের ভারী ইচ্ছে ছিল একজন যুবতী অ্যাসিস্ট্যান্ট রাখেন, কিন্তু বর্বিতার ভয়ে পারেননি। ইন ফ্যাক্ট, এই যে এত কম বয়েস থেকেই টানু শরীলচেতনা লাভলির, সেটা কিন্তু সে নিজের মায়ের জিন থেকেই পেয়েছে। তিলু রায়কে দেখতে মোটেই ভাল নয়, কিন্তু বর্বিতাকে যখন তিনি বিয়ে লাগান, মানে তার কলেজ লাইফে, সে তখন পুরো হুলবোমা। মানে বালতিতে চুবিয়ে রাখলেও ব্লাস্ট গ্যারান্টি আর কী। সুন্নার সেক্সি আর শরীলের যিদেও তুঙ্গে। অবশ্য বর্বিতার একটা গুণ আছে, মানতে হবে। আরও-আরও পয়সার কথা শুনলে তার সেক্সপনা চলে যায়। সেইভাবেই নিজের পারশ্বরমাজছা অনাশ্কে শিফটি মেরে নিয়েছেন তিলু রায়। এখন রোজ রাতে, বর্বিতা সিল্কের নাইটি পরে উরুতে ক্রিম মাখার সময়ে তিনি আলগা করে তাঁর পায়ের সামনে সারাদিনের ব্যাল্যান্স শিটটা ফেলে দেন। ব্যাস। একেই বলে নাম দিয়ে কাম মারা।

তবে হ্যাঁ, বর্বিতাকে এখনও কিছু বেমেতে হয়েছে। রোজ যখন সেক্সেণ্ডেক ফালতু জিনিস শপিং লাগাবে বলে বেরোয়, তখন গাড়িতে ওঠার সময় পাড়ার অনেকের চোখ লাট্টু হয়ে যায়। মা-মেয়ে একই সঙ্গে স্লিপিং দিচ্ছে, সব পাড়ায় এ জিনিস দেখা যায় না। বর্বিতা সেটা নিজের মধ্যে ধরে রেখেছে আর কী।

যেমন এত-এত উন্নতির পরেও তিলু রায় ধরে রেখেছেন প্রফিটের চূড়ান্ত যিদে আর ব্যবসার নয়া-নয়া স্ল্যান। আজও তেমনই এক স্ল্যান নিয়ে মায়নের সঙ্গে আলোচনায় টানা দিন্ছিলেন তিলু। যিদিপুরে একটা কুড়ি বাই কুড়ি কোনান অনেকদিন বন্ধ পড়ে আছে। ভাবছেন সেইটা টেকোভার করে একটা ব্রাঞ্চ লাগিয়ে দেবেন। রোকারেজ সঙ্গে কথাবার্তাও চলছে, মনে হচ্ছে জেমে যাবে। এখানে বলে রাখা ভাল, তিলু রায়ের এই চেম্বারটা সাউন্ডপ্রুফ নয়। ছোটবেলায় বাপ-মা মরা তিলু রায়কে গানই সঙ্গ দিয়ে এসেছে। মেনলি হিন্দি বইয়ের গান। তাই সাকসেস মারার পর গানকে তিনি ভুলে যাননি। সারাদিনের তুমুল ব্যবসার পর, সারারাত স্ল্যানিং সহযোগে হিন্দি গান শোনেন। গুইটাই তাঁর জীবনীশক্তি। বর্বিতার যেমন সেক্স বা ব্যাল্যান্স শিট, তেমন।

তবে এখন, মানে বড়লোক হয়ে যাওয়ার পর, তিলু রায়ের লাইফে কিছু মেজর ডিসিশন এন্ট্রি মেরেছে। আগে যেমন সব ধরনের গান শুনতেন, এখন তা না। নিজের বিজনেস মুডটাকে গঙ্গাই-মাঙ্গাই করে রাখার জন্যে কেবলমাত্র সোনালনা রিলেটেড গান শোনেন। সেই কারণে অবশ্য হিন্দি ছাড়া বাংলাও শুনতে হয়, কারণ একই ল্যাঙ্গুয়েজে একই সাবজেক্টে আর কতই বা গান তৈরি হবে। এখন, এই মায়নের মুখ জপ হচ্ছে সারাদিনে অন্তত একটা নিউ গান (সোনা রিলেটেড) সিডিতে ভরে আনা। পুরনো গানের সিডি তো আছেই, তবে পার নাইট একটা নতুন গান না হলে তিলু রায় কেমন একটা ভেপসে যান আর কী।

আজ মায়ন একটা ঝম্পরবীই গান এনেছে, বেংগলি। সেইটেই চপ ভল্যুমে বাজছে, হাত যখন পৌনে তিনটে। 'সোনা মুগের ডাল আমার সোনা মুগের ডাল / আজ আমাকে আদর করো রীধব তোমায় কাল'। তিনি বেঁচেছে। ডাল নিয়ে গান ঠিকই, কিন্তু সোনা কথাটা আছে। তাতেই হল। ডিরেক্ট গয়না নিয়ে আর কতই বা সং নামানো হয়। সুরে লিরিকে মাথামাখি হয়ে মাথা নাড়ছেন তিলু রায়, পাশে বসে খুশির চামচিকে হয়ে হাড় খাবছে রোগা মায়ন।

"তা হ্যাঁ রে, এ জিনিস কোথায় পেলি? খাসা বেঁধেছে কিন্তু গানখানা।"

"আর বলবেন না, ক্যানিং পেরিয়ে ইন্টিরিয়র। দেখি ভ্যানের টেপ বাজো থেকে বাজছে।"

"আহা, কার গান বল তো?"

"নতুন বই। এদিকে এখনও লাগেনি, গ্রামে হিট খেয়ে গিয়েছে।"

"নাম কী?"

"গ্রামের? কিমাপুর।"

"না না, গ্রাম না। বইটার নাম কী? তেমন হলে একবার ডিভিডি আনিয়ে..."

"ও। বইয়ের নাম আপনার হিন্দি বাংলা মিক্স করে দিয়েছে। আজকাল শুনলি বাংলা গ্রামেও যায় না তো।"

"হা। তা কী নাম রেখেছে?"

"'মুগে জেনে দো'।"

"বাহ্ নতুনও আছে। আমাদের গয়নার ডিজাইনের মতোই। বাহ।"

"দারুণ পোস্টার দেখেছে। মিনি সেন আর রুদ্রকুমার কাসিংয়ে। মিউজিক লিরিক রিকু ধাড়া।"

"আচ্ছা। এখন সোন, রোকারের কাছে যাবি কাল সকাল সাড়ে আটটায়। ড্রাইরে বান্ডিল রাখা আছে, নিয়ে যাবি। কোনও কথা শুনবি না, বলবি

সাতদিনের মধ্যে পঞ্জেশন চাই। বুঝলি?"

"ক্লিয়ার একদম। কিন্তু দাদা, একটা কথা বলব, যদি কিছু মাইন্ড না করেন?"

এই হচ্ছে মাখনের স্বভাব। তিলু রায়ের যেমন গান না শুনলে চ্যানস আসে না, মাখনেরই তেমনই কান না ডাঙালে ঘুম হয় না। অবশ্য তিলু রায়কে জয়েন দেওয়ার পর থেকে এমনিই তার ঘুমের মা-মাসি হয়ে গিয়েছে যাকে বলে। কান ডাঙানোর পাশাপাশি একচু তেল দেওয়া। সেইকি থেকে মাখনের নামটা টোটাল ঠিকঠাক আছে একদম।

"আহা, গানটায় মজছিলাম বেশ, এর মধ্যে আবার...আচ্ছা বল।"

"পাড়ায় কিন্তু অনেকে আপনার এনিমি।"

"এ আবার কী কথা মাখন? পাড়ায় তো আমি মিশিই না। এনিমি থাকতে যাবে কোন দুঃখে?"

"মেশেন না বলেই জানেন না, আছে। এন্তার আছে। তারা কেউ আপনার ভাল চায় না।"

"তাই? আচ্ছা। তা তারা আমার কী চায়?"

"ইজি ব্যাপার। লস। লোকসান। আপনি এত সাকসেস পাচ্ছেন, পেয়েই যাচ্ছেন, ব্যাপারটা সবাই সমানভাবে নেয় না দাদা..."

"তা তুই এতসব জানলি কোত্থেকে?"

"আমি আপনার কাজ করি দাদা, আপনার জন্যে চোখ-কান তো খোলা রাখতেই হয়।"

"বেশ। তা তারা কারা?"

"বললে আপনি বিশ্বাস যাবেন না।"

"না বললেও বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই, তবু শুনি?"

"মেনদি লাল, ওই গেঞ্জি কারখানার লোকটা। ও একেবারে আপনাকে দুচোক্ষে দেখতে পারে না। এ আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলে রাখলাম।"

"কে, ওই মোহন?"

"কী শ্রদ্ধা লাগিয়ে গুরু নামটা আপনি নিলেন দাদা, ও যদি তার টেন পার্সেন্ট রেসপেক্টও দাদা, ও যদি তার টেন পার্সেন্ট রেসপেক্টও..."

"কিন্তু এসব কথা আসেছই বা কেন? মোহন তো সেল ভাল মানুষ বলেই জানি। আমি রাস্তায় বেরোই না বলে দেখা হয় না ঠিকই, কিন্তু ছোটখাটো ব্যবসা করে উন্নতি করেছে, এক ছেলে বাইকে উকিল...তা মন্দ কী? বই, ওকে তো কখনও শুনিনি আমার নামে কোথাও কিছু বলতে।"

"আপনার মনটা না, দাদা, রামকৃষ্ণর মতো। এইজন্যে আপনাকে শ্রদ্ধা হয়। ওই মোহন কিন্তু হেবি জেলাস। কোথায় গেঞ্জি আর কোথায় গয়না। তুলনা হয় কোনও?"

"বলছিস?"

"বলছি মানে? আলবাত বলছি। ও যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনও জেঞ্জার গ্র্যান-ট্যান কষে তাহলেও অবাক হব না দাদা। ওই মোহন আপনার লোক ভাল নয়।"

"বড্ড বেশি বাড়িয়ে বলিস তুই মাখন। থাক, এসব নিয়ে তোকে ভাবতে হবে না। আমি আমার কাজ করে যাই, ব্যাস।"

"এইযানেই তো আপনাকে আমার মহাত্মা গান্ধীর মতো মনে হয়। তবে, আমার কথা পরে মিলিয়ে নেবেন।"

এই যে কোনও ক্লু ছাড়া একগাদা সন্দেহনিয়ে ঢেলে দিল মাখন, এইতে তার প্রাণটা একটু রিলাক্সিং পেল। সারাদিন কারও নামে মিথ্যে নিন্দে করা হয়নি বলে পেটটা কেমন মোচড় দিচ্ছিল, এখন ভাল লাগছে। টুথ হল এই যে, জন্মে সে সাড়ে মোহনের মুখ থেকে একটি বাক্যও শোনেনি, কারও কাছ থেকে স্যাড়ো মোহনের জেলাসি বিষয়ে নট আ ওয়ার্ড। কিন্তু এই যে দিল খাঁকিয়ে বিনুন মেরে, এইটায় তার হেবি হ্যাপিনা। আর এত দিলদরিয়া হওয়ার পরেও, রাত সওয়া তিনটে নাগাদ তিলু রায়ের মাথা থেকে মাখনের কথাগুলো টোটালি ইরেজ হয়ে গেল না। যচ্চয ফরতে লাগল।

"ঠিক আছে ঠিক আছে, ভাত তোকে ভাবতে হবে না। তুই এখন পরের গানটা চালা দেখি? কী আছে সিস্টে?"

"পুরনোই আছে একটা, তবে আপনার ফেভারিট।"

"বাহ্, লাগিয়ে দে।"

মাখন সবে সিডিও যাপ থেকে বার করে 'সোনে কি দুনিয়া, গুড্ডি কি চিড়িয়া' নামের হিট পাঞ্জাবি গীতটা লাগাতে যাবে, এমন সময়ে তিলু রায়ের দামি ফোনটা রিং মেরে কেঁপে উঠল। সুপার নিস্তব্ধতা। রাত সোয়া তিনটের সময় তিলু রায়কে কে ফোন করতে পারে?

তিলু রায় দেখলেন, একটা পনেরো ডিজিটের নম্বর, সামনে আবার প্লাস চিহ্ন। ব্যাপারটা ঠাহর মারতে না পেরে তিনি ভারী গলায় 'হ্যালো, কে বলছেন' বললেন বটে, কিন্তু তাঁর চেয়েও ভারী আর ঘড়ঘড়ে একটা বাপসামার্থ ভয়েস কী সব বুবধ্যা ল্যাঙ্গুয়েজে মিনিটখানেক বকে গেল। তারপর খটাস।

"কিছু বুঝলি?"

তিলু রায়ের অগোছালো ভাবটা কাটেনি।

"বুঝব না? নিঘাত ওই স্যাড়ো মোহনের কারসাজি। ও জানে রাত জেগে আপনি ব্যবসা বাড়ান, তাই আপনাকে ডিস্টার্ব করে ব্যবসার লোসকান করতে চাইছে। বলছিলাম কিনা আমি?"

"মাখন, মোহন এত বড় ব্যবসায়ী হয়নি যে এত বড় নম্বর ইউজ করবে।"

"কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে দাদা, বললাম না, অনেকেই জেলাস..."

"হুম।"

সে রাতে বিখ্যাত পঞ্জাবি গীত আর চলল না।

রায়পাড়ায় যখন এইসব এক্সাইটিং কেস ঘটছে, তখন সেখান থেকে প্রায় ৩০ কিমি ডিসটেন্সে, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের এক ধারে একটা বার কাম রেস্টুরেন্টে জড়ো হচ্ছে কিছু সাসপিশাস লোকজন। 'মাধবী' নামের এই বার কাম রেস্টুরেন্টে বার আর রেস্টুরেন্টের ব্যবসা কম হয়, কামের বিজনেসই ফলাও। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বার, কাম এবং রেস্টুরেন্ট, ঠিকই আছে।

রাত তিনটে নাগাদ স্টেজে উঠল বিখ্যাত বার-ডান্সার ময়না। তার মতো আর হয় না। লাশ্পটের একটা হিল্লোলল্লোত গোটা এলাকায় বয়ে গেল নিমেষে। এই মধ্যে মাধবীর ক্যানকেন দরজা খুলে একের পর এক এন্ট্রি নিচ্ছে কাতিলানা চরিত্র। দেখলেই বোঝা যায়, টেনেটুনে টু পাস, মুখে হাসি বুকে লাল টাইপের লোকজন। প্রত্যেকের কোমরে মিনিমাম একটা করে গুড়ুমমুন্ড থাকবেই থাকবে। এরা এখানকার চেনা খদ্দের, কারণ ঢোকা মাত্র একটা বেশ এলেবেলে হইচই পড়ে গেল। সেসবকে তুড়িশাঙা অব্দি না দিয়ে চারজন চিকনা কাতিল বারের কুঝুরি পর্দা সরিয়ে একটা রগড়াই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। একটা ছোট ঘর, সেখানে তুমুল গোলাপি আলো জ্বলছে। তারা ঢুকে বুট সুট বিছানায় দেগে দিয়ে রেলাসে বসামাত্র তড়াং তৎপরতায় চার প্লেট চিকেন টেংরি, পেঁয়াজ পকৌড়া, সোডা আর হুইস্কি চলে এল। রাত তিনটে নাগাদ এই পারমানবিক মেনু নিয়ে যারা মিটিং-এ বসল, তারা কে এবং কেন, এই মোমেন্টে এট্টু জেনে রাখা বেটার।

বিছানার গলপাদান ডাঁসায় মাথাদি ডায়ামিটারের পোক্ত কোমর ঠেকিয়ে গালে কাটা দাগওলা রাগী মুখের যে-মাধবরসি লোকটা বসে, এরিয়ায় তার নাম ছোটা মহেন্দ্র। মেনলি খুন-সুন করে আর কী। এলাকার সকলেই ওকে ভালো লাগেও ছে, এই মালের নামই যদি ছোটা মহেন্দ্র হয়, তাহলে বড়া মহেন্দ্র কী জিনিস হবে। পরের ক্যান্ডিডেটকে চিনে নেওয়া যাক। বিছানার সামনের সোফায় বসে একটা ধারালো চাকু দিয়ে বাড়িওলা যে-ছোকরা মৈনি ছাঁচছে, তার নাম বিরকিস, সে ছোটা মহেন্দ্রর ডান হাত। ডিম ঘেলে পেট, চাকুর এক স্ট্রোকে যে-কোনও জিনিস লবেজান করে দিতে পারে। ওপাশে একটা টেবিলের সামনে ইডিমেইরই টেংরি চুষছে যে-দু'জন, তারা মাইনর ক্যারেক্টার, কিন্তু বডি মেজর। মনা-কনা দুই ভাই।

এই ছোটা মহেন্দ্র খুব ছেটিবেলায় যত্তরানক অরফ্যান হিসেবে আব্বিক্তত হয় রাস্তার ধারের একটা ক্যানেস্তারায়। জ্ঞান লাগতেই সে বুঝে নেয় এই পাপী দুনিয়ায় কীপি ঘুলতে গেলে ট্যাগনাট্যাডড হয়েই বাঁচতে হবে। অতএব প্রথম থেকেই উপ ডেভিডেশন নিয়ে অন্ধকারের পথে গামবুট পরা পা-ফা বাড়ায় আর কী। নাম ফাতরে বেশি দেরি হয়নি, অ্যাডাল্ট হওয়ার আগেই এই টিম তৈরি এবং এলাকার সার্বক টেরর।

এভাবেই তোমা গড়াছিল লাইফ, কিন্তু রিসেন্টলি হুবহু ধেকে আসা এক ডনকে দেখে ছোটা মহেন্দ্র'র আঁতে হেবি লেগেছে। তার ড্রেস,

চামচিকা, লোকজন, গাড়ি-ফাড়ি দেখে ভ্যানে বসেই ছোটা মহেন্দ্র টোটাল ঈথমিনা হয়ে ওঠে। এমন করে না বাঁচতে পারলে সে কীসের ডন?

সেই থেকেই ছোটা মহেন্দ্র ঠিক করেছে, এবার কিছু বড় দাঁও মেরে কোথাও একটা দ্বীপ-ফিপ কিনে ফুল সেটল মেরে যেতে হবে। তা এই জীবন পেতে গেলে যে-প্ল্যানিং দরকার, তার জন্যই যেগে-যেগে বিভিন্ন ডেসটিনেশনে ঘিম নিয়ে নৈশ মিটিং করে বেড়াচ্ছে ছোটা মহেন্দ্র। আর কিছুদিনের মধ্যে হাতে অনেক টাকা না এলে ইজ্জতের চাউমিন হয়ে যাওয়ার একটা হাই চান্স আছে। সেটা সে মরে গেলেও হতে দেবে না। একটা মেয়ে বাইরে থেকে পরজাটা টেনে দিয়ে যাওয়ার পর ডায়লগ শুরু হল।

"ম্যাগিং পাল্লা আছে তো? কী রে?"

"একদম উস্তাদ। তোমাকে ভিডিয়ো দেখিয়ে দিচ্ছি সব।"

"জি তুই না বললেও আমি দেখে নেব। বড় হাত, কোনও রিস্ক নয়।"

"জি উস্তাদ।"

"কবে নাগাদ প্ল্যান করছি আমরা তাহলে?"

"এর মধ্যে যেদিন বিসমিল্লা বলবে। চাকনাচুর মণ্ডসম আছে, এনি ডে অ্যাটাক।"

"ডে নয়, নাইট। রাতের অন্ধকারে সালা মিউট মোড়ে কাজটা সালটে ফেলতে হবে।"

"হয়ে যাবে। এই কাজটা হোক। দেখবে এরিয়া তো কোন ছার, তোমার নাম ইন্টারপোল অব্দি ফ্যায়লে যাবে।"

"সেটা আবার কী রে? একডিঙ পোল শুনেছি। ইন্টারপোল..."

"ওই একই কেস, একটু অন্যরকম।"

"ওকে। তুই ম্যাগিং দেখা।"

মাধবী বার কাম রেস্টুরেন্টের এই ঘামাচি সাইজ় গোলাপি ঘরের মধ্যে একটা নিন্থ চর্ম ছেলে নিয়ে বিলকিস হিপ পকেট থেকে একটা কাগজ টেনে বের করে এনে তার ভাঁজ খুলে ছোটা মহেন্দ্রর সামনে মেলে ধরল।

"এই হল ফুল প্ল্যান আর ম্যাগিং উস্তাদ। কেস পুরো রেডি আছে। এখন তুমি ইশারা দিলেই কাজ হাসিল।"

"সালা হেবি বড়লোক মাল আছে রে। চারটে বাথরুম, তা-ও এই সাইজ়ের? ঘুটো কিচেন, তিনটে গেস্টরুম?"

"অনেক মাল কামিয়েছে।"

"কিন্তু লোকটা কেমন?"

"লোকেরও ম্যাগিং করা আছে উস্তাদ। এমনিতে বেওসা চালায় ভাল, কিন্তু অওলাদ বোলে তো সেন্সলেস। এক সেকেন্ডে মাল ছাড়তে রাজি হয়ে যাবে। জাস্ট এক সেকেন্ড।"

"পুলিশ-ফুলিশকে বলবে না তো?"

"আরে উস্তাদ আমাকে কি কচ্চা বান্দা পেয়েছ তুমি? পুলিশকে ও কি বলবে? পুলিশকে তো আমি বলে রাখব। ফাইভ পার্সেন্ট। কথা হয়ে আছে।"

"তা কবে কাজে হাত দিবি ভাবছিস?"

"দেখো, সামনের শুক্রবার ভাল দিন, তার উপর অমাওয়স আছে। তুলে নিই?"

"নিবি?"

"নিই?"

"নে তুলে। তারপর দেখা যাবে।"

"আরে দেখা কী যাবে উস্তাদ! পেটি-পেটি মাল দু'দিনের মধ্যে না এসেছে তো আমার নাম বিলকিস নেই।"

"বলছিস?"

"আলবাত বলছি।"

"ওদিকে জায়গা দেখা আছে তো? এক-দু'দিনের মামলা কিন্তু।"

"ফুল দেখা আছে উস্তাদ। এই ন্যাখো।"

বলে বিলকিস আর-এক হিপের পকেট থেকে একটা সেলফোন বার করে গ্যালারিতে গিয়ে ছোটা মহেন্দ্রকে কী সব ছবি দেখাতে লাগল।

"লোকেশন দেখেছ উস্তাদ? লাখৌ মেঁ এক। কোনও সালা নজরে আনতে পারবে না।"

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু..."

"কোনও কিন্তু নেই উস্তাদ, মাথায় হাথ রেখে বলো, তুলে নিয়ে আসি। বড় কাজে কোনও কিন্তু কোরো না। দেখবে, এ তো সিরফ শুরুআত। আগে-আগে কী হয়..."

"তোর মুখে ঘেঁটি আর স্কচ পড়ুক বেটা।"

বলেই ডানদিকে তাকিয়ে সারপ্রাইজের সঙ্গে ম্যেয়াল করল ছোটা মহেন্দ্র, গোটা গায়ে হুইস্কি আর ঘেঁটির মশলা মেখে মনা-বনা টাসু হয়ে নেতিয়ে আছে।

"এদের নিয়ে তুই কাজ করবি? দেখছিস তো কী হাল দুটোর।"

"কিছু ভেবো না উস্তাদ, আমি ঠিক লোক সঙ্গে রেখে নেব। তুমি শুধু হাঁ বলো, ব্যস।"

"হ্যাঁ। শুরু হো যা বেটা। কিন্তু এক সওয়াল।"

"আবার কী?"

"ওদের বাড়িতে শুনেছি কুত্তা আছে? যতরনাক?"

"উস্তাদ, আমার থেকে যতরনাক কুত্তা তুমি আর দেখেছ?" বলে একটা নেকড়েহাসি ঘরের দেওয়ালে লেলিয়ে দিল বিলকিস। ছোটা মহেন্দ্র হালকা হল। মনে ও কোমরে। বেল্ট খুলে রাখল। এবার তার সঙ্গে মমনার একটা মিরিমিনন হবে। গোলাপি ঘরটা কয়েক মোমেন্টের জন্যে হেভেন হয়ে উঠবে। ছিবড়ে হয়ে পড়ে থাকা একটা টেবিল দিকে তাকিয়ে ছোটা মহেন্দ্র একবার জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নিল।

ভোররাত থাকতে টেনেটুনে জগিং লাগাতে বেরিয়ে পড়লেন বিলিতি বোস। শার্ট, পাজামা, স্নিকার। কোনও কথা হবে না। প্রায় বারো বছর পর জগিং লাগাচ্ছেন, তাও স্রেফ উত্তেজনার বশে। সাড়ে চারটে বাজে, কোনও মাই কা লাল ওঠেনি। উঠেছেন আমাদের বিলিতি বোস, হেথ্থ টইটম্বুর বানাতে ডিরেক্ট রাস্তায় নেমে পড়েছেন। এই মোক্ষম মোমেন্টে তাঁর মনে হল, জীবনের এই সুখ নিজে একা না টেনে, শাগরেদ টফি দে-কেও বিলনো উচিত।

টফি দে-র বাড়িতে এমনিতে থ্যামেলা বলতে তেমন কিছু নেই, জাস্ট বয়স্কা মায়ের দুশ্চিন্তা। মায়ের ন্যাকেলাল চিন্তা ছেলের কেরিয়ার নিয়ে, টফি দে বড় হয়ে কোন ফিল্ডে নিজ অবদান ঢালবে, এই ভেবেই তিনি আকুল। তাঁর ধারণা টফি দে-র বড় হতে এখনও কিছু বাকি আছে। এখন, বাড়িতে গেলেই বিলিতি বোসকে এই ধরনের নির্মম কোশ্চেন ফেস করতে হয়, যেটা তিনি এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচেন আর কী। আজ যে টফি দে-র বিরাট স্বাস্থ্যোদ্ধারে বেরিয়েছেন বিলিতি বোস, কেস এমনও সরল নয়। গতকাল রাতের পর থেকে তাঁর মনের চিলেকোঠায় সাড়ে তিনশো ডবকা সিলমাছ উলু মারছে, সেইটেই কোথাও এট্টু এক্সপোস না করতে পারলে হার্টে বিট লেগে মারাই যাবেন ক্লেট।

গতকালের ইভিনিং থেকে মোমরাত, গোটাটাই জেগে কাটিয়েছেন বিলিতি। চিরকুটো লবেঞ্জান আলোয় চোখের সামনে গুণেন করে ধরার পর প্রথমটায় তাঁর বিলিভিং হয়নি, কিন্তু তারপর মার দিয়া কেল্লা কাড় দিয়া জেল্লা টাইপের একটা ফগাব ডাঙ্গ তিনি গুই ছোট ঘরের চৌহদ্দিতেই শানিয়েছেন মিনিট তিনেক ধরে।

"টফি আছে নাকি মাসিমা?"

প্রশংসতা টফি দে-র মা মুখ ধুয়ে বিলিতিকে কোশ্চেন লগলেন, "কত বলি ভোরবেলা ওঠ, কেরিয়ারটা নিয়ে ভাব, তারপর গিয়ে বিয়ে-টিয়ে লেগে যাবে। তা কে শোনে কার কথা। আপনি এই এক আছেন বলে আমার যা ভরসা, আপনি ভাবতে পারবেন না। আমার কোনও কথা তো কানেই তুলতে চায় না, আপনি বললে যদি বা একটু কাজ হয়।"

"সে কি আর আমি বলি না? বলতেই তো ভোর-ভোর ছুটে এলাম। একটু ডেকে দেবেন ওকে?"

উসিদ মা 'টফি' অ্যাই টফি..' করতে-করতে ভিতরে ঢুকে গেলেন, সুনসান পাছুভোরে রাস্তায় বিলিতি বোস হাফসৌড় মেরে দাঁড়িয়ে। একটা কেকিল্ল কোন কানাচ থেকে কুহু মারছে, সেইটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এ আনার ট্রাই নিতে-নিতেই টফি দে রোগা দোমঙলা পা বার করা নিমু শর্টস পরে টলতে-টলতে দেয়ার হাজির।

"সারারাত ঘুমোসনি?"

"ঠিক বুঝতে পারিনি।"

"মানে? এ আবার কী কথা। বুঝতে পারিনি মানে? নেশা-টেশা করছিস নাকি?"

"এমন নেশা যে হয়, আগে তো জানতাম না।"

"টফি, তুই কিন্তু এবার বড়া খাবি। কাজ নেই কম্ম নেই নেশা করে বেড়াচ্ছিস? মাসিমা কী কষ্ট পাবেন বল তো?"

"তুমি বুঝছ না। চলো, দৌড়বে তো? আমি বলছি।"

দুটো ক্যারেক্টার পাড়ার গলাতইগুলো ঠোনা মেরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে দৌড়তে-দৌড়তে চলে অদৃশ্য হল।

মিনিট পাঁচেক কোনও কথা নেই, স্রেফ রানিং। বিলিতি যেয়াল করলেন, সান গ্লাস একটু আগে, একটা ল্যাম্প মার্কা আলোয় তাঁদের পাড়া একটা বিকুবিঝমনা ভাব নিয়ে নেতিয়ে পড়ে আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আর-একটু ডিপ করে কথা শানাতে যাবেন, এমন সময় টফি দে ছুটি চাইল।

"আমার কিন্তু সিরিয়াসলি তোমাকে কিছু বলার আছে আজ। তোমার রিঅ্যাকশন কী হবে জানি না, কিন্তু আমার লাইফ ডেথের ম্যাটার।"

"সে কী রে? আচ্ছা? স্ট্রেঞ্জ! আমারও ইন ফ্যাক্ট তোকে কিছু বলার আছে বলেই এত সকালে এসে তুললাম। খুব গোপন একটা সিক্রেট, ভোরের রাস্তা ইজ দ্য বেস্ট। এই সময়ে দেওয়ালগুলোও ঘুমোয়।"

"তাই? আচ্ছা। তাহলে বসে নিই কোথাও? দৌড়তে-দৌড়তে আমি কথা বলতে পারি না।"

পাড়ার একটা নিভুমাঠের বেঞ্চিতে পবিত্র ঘামমাখা দুটো মূর্তি এসে জিভ বের করে বসল। পাছে জিভের রানওয়েতে পাখিরা ভোরের দান রেখে যায়, সে জিনিস বেশিক্ষণ চলল না।

"বল এবার, কী কেস?"

"আমি আগে বলব?"

"অফ কোর্স। তুই বয়েসে ছোট, প্লাস টেনশন সহ্য করতে পারিস না। বলে দে।"

একটা পায়রা হালকা পটি ডাইভ মারিয়ে বনাৎ করে উড়ে বেরিয়ে গেল। টোটাল নিস্তব্ধতা। টফি দে-র চোখে গভীরে একটা ঝিল দেখতে পেলেন বিলিতি বেসাং। তাতে বোয়াল খেলে বেড়াচ্ছে।

মহাঘামজামা নিয়েই গলাম করে টফি দে-কে টেনে জড়িয়ে ধরলেন বিলিতি।

"উফ! এ তো দারুণ ব্যাপার। একেবারে মর্ন কা বাচ্চার কাজ করেছিস! এই বয়েসে একটা প্রেম ছাড়া পুরুষ মানুষের ইচ্ছত থাকে? আমি খুব হ্যাপি হলাম রে। মাসিমা কত বুদ্ধিস্থা করেন তোকে নিয়ে। তোর বিয়ে-টিয়ে নিয়ে এইবার একটা হিল্লে হল। আর চাকরি নিয়ে ভাবিস না, আমার কথাটা শুনলেই রিলিফ পাবি।"

টফি দে সুয়ারচুপ। সর্বত্র কুলুপ। হাতুটো কালেষ্ট করে কোলে ড্রপ করা। মুখ নিচু। বিলিতি বোস ব্যাপারটা ঠিক আন্দাজিয়ে উঠতে পারলেন না। এ বয়সে প্রেম হলে পাকপাড়া থেকে প্যারিস জিতে নেওয়ার একটা লাস্ট চান্স মাথায় কিলবিল করে, আর এ ছোকরা স্যাড ডারশান খেলাচ্ছে।

"কী রে, কী হল? মাসিমাকে নিয়ে চিন্তা করিস না, ও আমি বুঝিয়ে নেব ঠিক।"

"তুমি বোঝাতে পারবে না।"

"তুই বিলিতি বোসকে চিনিস না। কত লামড়া দুশমনকে জীবনের সহজ পাঠ বুঝিয়ে এলাম রে এতদিন, মাসিমা তো সামান্য ভদ্র মানুষ।"

"তুমি নিজেই হয়তো বুঝবে না।"

"কেসটা কী এবার বলবি?"

"আমি যাকে ভালবাসি..."

"হ্যাঁ, সে কী?"

"আমি যাকে ভালবাসি..."

"সে হাফপ্যান্ট পরে?"

"আমি যাকে ভালবাসি..."

"আরে কী? সিগারেট খায়?"

"উঁহু, আমি যাকে ভালবাসি..."

"এ তো আচ্ছা জ্বালা রাজা। অন্য ধর্মের মেয়ে?"

"নাহ্! আমি যাকে ভালবাসি..."

"বলবি, না ঝাড় দেব?"

"সে মেয়েই নয়। মর্দ।"

একটা বেড়াল হরধন্ব হয়ে শুয়ে ছিল, এমনকী সেও একটা বাসিমুখের ফ্যাঁও শুনিয়ে মাঠের রেলিং টপকে হাঁ। দূরে, কাশ্মীর-সাশ্মিরে একটা হিমবাহ গুড়ুম ভাঙছে। সান উঠল। ঠক করে। বিলিতি বোস গুম এবং স্ট্রেঞ্জ হয়ে বসলেন। টফির ঘনাগোঘের কিনারায় একটা জলের বল ডেলিভারি হচ্ছে, গালের কাছে এসে সুইং করবে।

"কী, এবার হল তো? তুমিও সাইলেন্স। জানতাম। আমি জানতাম।"

"একটু চুপ করে থাক, ভাবতে দে।"

"কী ভাববে?"

"উফ্, টফি, তুই আজও আমাকে চিনলি না। আমি কোনও কিছুতেই ঘাবড়াই না। নাগরাকাটার জঙ্গলে একবার...আচ্ছা সে থাক এখন। রিলেশনশিপ মানে রিলেশনশিপ। ফরমাটটা তোর একটু আলাদা হয়ে গিয়েছে ঠিকই, সেটা নিয়েই চিন্তা। ছেলেটা কে?"

"হাক্র।"

"হাক্র মানে? ওই মিষ্টির দোকানের ছেলেটা?"

"ওহ্, ও ওইসব ব্যবসায় যাবে না। ওর এইম আলাদা।"

"তাই? তা কী এইম?"

"পকেট।"

"মানে? একটা ভদ্রবাড়ির ছেলে পকেট কেটে যাবে? এইটা তার প্ল্যান? আর তাকে তুই ভালবাসছিস?"

"আরে না রে বাবা। পকেট মানে ক্যারামের পকেট। দুদ্দান্ত ক্যারাম খ্যালে। দারুণ টিপ। এই ধরো এখানে বসে ওই রেলিং-এর কাছে একটা ঘুঁটি রেখে যদি লাগাতে বলো, লাগিয়ে দেবে।"

"হুম। বুঝলাম। আর তোরাঃ"

"মানে?"

"করেছিস? সেক্সঃ"

"ছিঃ ছিঃ, না না। একটু ক্লাস...তোমাকে বলতে কিছু নেই, মানে, একটা কিস।"

"হুম। ব্যাপার ভালই জটিল।"

"কিন্তু ওকে না পেলে আমি মরে যাব। জাস্ট মরে যাব। কোনও কিছুতে মন বসছে না, বিশ্বাস করো, সামনে একটা কম্পিটিটিভ একজ্যাম, কিন্তু বই খুললেই ওর মুখটা ভেসে উঠছে।"

বিলিতি বোস একবার ভাববার চেষ্টা করলেন হাক্র আর টফি দে পরস্পরের তুমুল ঠোঁট চুষছে, পুরো ইমেজটা কিছুতে ফ্রিয়েটই করতে পারলেন না ব্রেনের ভেতর। অথচ ধরা দিবি চকাচকপ করে ফেলেছে।

"ব্যাপারটা এক্ষুনি মাসিমাকে বলিস না।"

"পাগল? এক্ষুনি কেন, হয়তো কোনও দিনই..."

"ন্যাকামো করিস না। প্রেম করেছিস, বেশ করেছিস।"

"তুমি বলছ? তুমি সাপোর্ট করবে?"

"এ কি ইলেকশন নাকি যে সাপোর্ট চাইছিস? নিজের উপর ভরসা নেই?"

"আ...ছে...তবে তুমি, যাকে বলে, আমি গুরু মানি আর কী। জানি তো। ছেলেতে-ছেলেতে হয়ে তো কেউ মেনে নেয় না। মা? না কিছু একটা হয়ে যায়।"

"তোর মা'র দায়িত্ব আমি নিলাম। আর ওই হাক্র? ওর বাড়িতেঃ"

"ওর বাড়ি মানবে না।"

"তাহলেঃ"

"আমরা অন্য কোথাও শেল্টার নেব।"

"অনেক দূর ভেবে ফেলেছিস দেখছি।"

"কী করব বলো, নর্ম্যাল প্রেম হলে..."

"এই। এইখানেই আমার আপত্তি। নর্ম্যাল কাকে বলে কেউ জানে? তুই জানিস? এই যে আমার মতো একটা দুঁদে আন্ডার কাভার এজেন্ট ওপেনলি জানিং করছে। এটা নর্ম্যালঃ তাহলেঃ ওসব ভাবিস না, লড়ে যা, আমি আছি।"

এবার উল্টোটা ঘটল। ন্যাতানো জামা নিয়ে টফি দে জড়িয়ে ধরল বিলিতি বোসকে। সঙ্গে কান্না।

"তোমাকে যে কী বলে আমি..."

"কিছু বলতে হবে না। এবার আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোর ভোটার আই কার্ড আছে তোঃ"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে।"

"আর সাহসঃ"

"রায়পাড়ার বুকে একটা আস্ত ছেলেকে ভালবেসেছি বোসদা, এরপরেও..."

"আচ্ছা আচ্ছা, বুঝেছি। বাই দ্য ওয়ে, আজ রাতে কী করছিস?"

"কিছু না, পড়তে বসে হারুর কথা ভাবব। কেন, কোনও কাজ...?"

"এখনই ঠিক ডিটেলে বলতে পারছি না, কিন্তু হলেও হতে পারে। সেক্ষেত্রে তোর লাইফ কিন্তু পুরো বদলে যাবে, এই বলে রাখলাম।"

"আমার লাইফ, কী বলব, অলরেডি বদলে গিয়েছে।"

বিলিতি বোস বুঝলেন, টফি কে বিদ্ধ সি আঁখো মেঁ এখন অন্য কোনও প্রতিদ্বন্দ্বি পাশ মাড়াচ্ছে না। হারুর বিস তাকে জানুয়ারে করে তুলেছে আর কী।

"যা-ই হোক, আর-এক দফা বলাতে পারে, রাতে রেডি থাকিস, ডেকে নেব।"

"কোথায় যাওয়া?"

"কৌতূহল যে-মানুষ দমন করতে পারে না, তার পক্ষে মহান হওয়া সম্ভব নয়। কার বিখ্যাত উক্তি, বল।"

"এখন জাস্ট মনে পড়ছে না।"

"হর্ষ ভোগলে। এবার গুঠ।"

দুটো অন্যরকম সিল্যুয়েটওলা চরিত্র বেঞ্চ থেকে টকাস উঠে পড়ল। স্টরেপ আইসক্রিমের মতো আলো তখন বেঞ্চির কানায় এসে জিভ বোলাচ্ছে, এই আলোই বেলা বারোটা নাগাদ রোলার হয়ে যাবে। টফি দে-কে বাড়ির দিকে এগিয়ে আবার সৌড়নো শুরু করলেন অন্মা বিলিতি বোস। আজকের রাতটা হেবি ফুশিয়ল।

হারুর ঘুম কিন্তু ভেঙে যায় খুব আর্লি ভোরে। পাখির ডাক-ফাকে নয়, বাড়িময় গাঢ় ছানার গন্ধে। সে কিছু মিশিও থাকে শোভলাল একটা ছোট ঘরে, কিন্তু বাড়ির সামনেটাই তো বাপের মিষ্টির দোকান। আর সেই দোকানের লাগোয়া গোডাউনে এত্তি সকালে যখন চারদিনের পচা ছানার ক্রেশ ডেলিভারি হয়, তখন গোটা পাড়া একবার আন্টু চৌধুরীর ক্ষতি চায়। গোপনে। তা সে-গন্ধ যে সকলের আগে হারুর ঘুম ভাঙাবে, এতে আর ননবিলিভিংস কী আছে।

হারু অবশ্য বাথরুমে ঢুকে, নিজেরে, খুব সিক্রেট ভাবে রেসপেক্ট করে। মুখে বা আচ্ছরে একটা বুঁদনা রেবেল গোছের ব্যাপার রাখে ঠিকই, কিন্তু অন্তরে টোটাল শ্রদ্ধা। মুখে রেসপেক্টটা ফুটিয়ে তুললে বাবা ডেফিনিটলি পেছে বসবেন এবং পেছে বসা মানেই এই অভিশাপগ্রস্ত স্যামিলি বিজনেসে তাকে জন্মের মতো এত্তি নিতে হবে। যেটা সে মোটে গোলেও চায় না। সে চায়, আর দশ বছর পর যে অলিম্পিক খেলা-টেলা হবে (সম্ভবত রাশিয়ায়), তাতে উলেম পার্টিসিপেট লাগানো। সে বছর থেকেই নাকি ক্যারম স্থান পাচ্ছে এই মিলনমেলায়। রাশিয়া নিয়ে ছোটবেলায় কিছু বই-টই পড়েছে হারু, পাড়ার লাইব্রেরি থেকে সাঁটিয়ে। তের জায়গার প্রতি তার বিশেষ মোহ-কোহ নেই, তার পাখির চোখ ক্যারমের চারটে পকেট। দু'চোখে চার-চারখানা পকেটের স্বপ্ন নিয়ে রাতের পর রাত রাশিয়ার ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থাকে হারু। সে জানে, এই দুনিয়ায় টিপ যার, রানি তার।

এই জানা থেকেই তার উত্থান। জিবানন্দ। চার দিনের পচা ছানা, কবেকার কেটে যাওয়া দুধ, গতজন্মের গুড়, এইসব নিয়ে তার বাবার গোডাউনে যখন লোকজন ঢোকে, জাস্ট সেসব সে জাগে। গন্ধে আর স্বপ্নে। ডবল এফেক্টে। বাবারা থেকে ব্যাথে, বাবা কতুয়া আর লুঙ্গি পরে লোকজনদের রোজকার ইন্ট্রাডাশন দিচ্ছেন, যেগুলো বছর পনেরো হল তাদের মুখস্থ। পনেরো বছর হল লোকজন পাচ্ছারিন, কারণ নতুন উদ্যমী কর্মী জোগাড় করে উঠতে পারেননি আন্টু চৌধুরী। পাড়ার বহু ছেলে না খেতে পেয়ে মরবে, তবু তাঁর মিষ্টির দোকানে নয় জয়েন লেখাবে না। এই জন্যেই বাজারির কিছু হয় না। আজ সকালেও সমস্ত আদিলর্মীদের নাকে রুমাল বাঁধা, কারণ তাদের অনেকেরই এলভাইসি করানো নেই। কেবল আন্টু চৌধুরী বীরদর্পে আঙুলের ডগায় পচাছানা তুলে এনে শুঁকছেন। দোকানের গুডউইল বলে কথা।

এই জন্যেই বাবাকে এতখানি ইনার রেসপেক্ট দেয় হারু। স্যামিলিতে মিষ্টির ব্যবসা শুরু করেছিলেন তার ঠাকুরদা, গলদা হতে শুরু দোকান ছিল। কেলারের সন্দেশ। সে আমলে কেলার চৌধুরীর দোকানে মিষ্টি যায়নি, এমন লোক পাওয়া ডিফিকাল্ট ছিল। পরে কিন্তু সেই ব্যবসা চালানোই ডিফিকাল্ট হয়ে পড়ে। কারণ নয়া-নয়া ব্যবারের ভিড়ে, মিউ-নিউ সুইট ডিশের হড়বড়ানিতে কেলার চৌধুরী তাল হারিয়ে ফেলেন। তিনি মিষ্টির মডেল পাল্টাবেন না, কিন্তু পাবলিক তো পাল্টে পড়ল হয়ে গিয়েছে। দোকান খড়াঁড়ি মার খেতে শুরু করল। এক ভোরবেলা চাট্টি বাচ্চা ছেলে ক্ষীর খেতে এসে, 'মেসোমেসায় ডিলি সস হবে?' বলায় কেলার চৌধুরী দোকানেই ডিরেক্ট বডি রামেন। মিষ্টির জগতে শুদ্ধা সহকারে তাঁকে 'শহিদ কেলার' বলে উল্লেখ করা হয় ঠিকই, কিন্তু দোকানটা তুলে দিতে হয়।

জেল তখন নাগপুরিয়া বাবুদের মতো চেপে বসেছিল ইয়ং আন্টু চৌধুরীর মাথায়। এই মিষ্টির ব্যবসাতেই তিনি সাকসেস এনে তবে ছাড়বেন। কিন্তু অন্যভাবে। পাবলিক যেমন পাল্টেছে, তিনি আরও পাল্টাবেন। চূড়ান্ত পচা মিষ্টি ছাড়বেন বাজারে। লোকে নিজের বাড়ির জন্যে এক হাঁড়ি পাশের দোকান থেকে কিনবে, শত্রুদের বাড়ির জন্যে লশ হাঁড়ি তাঁর দোকান থেকে। কালে-কালে হয়েছে তা-ই, এখন তো ভাবছেন রায়পাড়ার বাইরে, বেহালা বাজারে একটা দোকান লশ্চ করবেন।

এই জাফরি জেদের জন্যেই মনে-মনে বাবাকে লাইক মারে হারু, মুখে বলে না। আজও কিছু বলল না, সকালে উঠে যেটা করে, সেটাই করতে শুরু করল। টিপ প্র্যাকটিস। এটা হারুর মোক্ষ, সাধনা, ডলির ডিভিটাল ভালবাসা। ভাল সে অবশ্য টফিকেও বাসে, আর জাস্ট ইয়েস্টারডেই সেটা শরীলে মনে ফিল করতে পেরে বেশ চাঙ্গা হয়ে আছে এখন। টফির নরম ঠোঁট আর পিঠের গড়ন মনে পড়তেই হাঙ্কার উপর লাইট করে হার্ড হয়ে গেল হারু। শরীল হার্ড মানে মন সফট। এই হল দুনিয়া কি রীত। কিন্তু এখন এসবের সময় নয়। দশ বছর। চার পকেট। এক অলিম্পিক। রাশিয়া।

হারুর টিপ প্র্যাকটিসের ব্যাপারটা অবশ্য যে না দেখেছে সে বিলিভ যাবে না বক্সনও। এসপ্ল্যানেডের নামি দোকান থেকে নামি ঘুঁটির দু'খানা সেট কিনেছে সে, সেগুলো আলমারিতে তুলে রাখা। বাড়িতে সে প্র্যাকটিস করে সন্দেশ দিয়ে। এমনকী আন্টু চৌধুরীর দোকানেও কিছু মাল 'বাসি' বলে ফেলে দেওয়া হয়। মানে দিন পনেরো পেরিয়ে গেলে, যখন বুলডোজার ছাড়া তাদের কেউ এ পৃথিবী থেকে সরাতে পারবে না, সেই মোক্ষম মোমেন্টে। আর সেগুলোর মধ্যে সন্দেশগুলো নিয়ে নেয় হারু। ক্যারমের ঘুঁটির পারফেক্ট বিকল্প যাকে বলে।

আপাতত রানির পাশে হারা দিয়ে বসে থাকা একটা কালোকে সতের দিনের বাসি পাঁড়া দিয়ে গজফাঁই করার তাল ঠুকছে হারু, এই সময়ে টিটো এসে হাজির। টিটো লেখক, এই ষোলো বছর বয়েসেই গুর তিনটে ছড়ার বই আছে। কারণ গুর বাবা পাবলিশার, গ্রাস পাড়ার মোড়ে একটা ছোট্ট বইয়ের দোকান চালান। বাড়িতে যাবতীয় অশান্তি রুখতে বছরে ছেলের একটা করে বই ছাপার পিসফুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছেন।

"হারুদা, শিগগির চলো, দারুণ ব্যাপার। দেখবে চলো।"

রাশিয়া অলিম্পিকের চেয়ে দারুণ কী হতে পারে, হারু জানে না। সে গম্ভীর আনসার মারল,

"এখন ডিস্টার্ব করিস না। যা। পরে আসছি।"

"আরে ধুর এসেই না, কী মজার একখানা কাণ্ড হয়েছে।"

"কী হয়েছে আগে বল, তারপর ভেবে দেখছি।"

"আমাদের বাপিরা আছে না..."

"কে, স্টাইক না বাইক? স্টাইকের কথা হলে আমাকে বলবি না। যা হয়েছে হোক।"

পাড়ায় এই একটি ছেলেকে একটু আড়ে ধিংকিং দেয় হারু। স্টাইক বাপি। গুকে দু'-চারবার যেতেও দেখেছে সে, বুঝেছে, ছেলের এলেম আছে। সে এলেম থাকে থাক, দুনিয়ায় সেই একা ক্যারামকুমার, এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু একই দেশ, একই স্টেট, মায় একই পাড়ায় গেলে কুছেক নির্ঘাৎ অলিম্পিকে চান্স দেবে না। তাই স্টাইক বাপির ব্যাপারে সে একটু হার্ডও গুখানে নয়, মন থেকে।

টিটো উত্তেজনার লেভেল বাড়িয়ে উত্তর দিল, "আরে স্টাইক নয় স্টাইক নয়। বাইক। তবে গুর আর গুই নামটা থাকবে কি না তাই যে জানে..."

"মানে?"

"আরে এত এখানে বলতে গেলে মজাটাই মাটি। কী অদ্ভুত ব্যাপার। প্লিজ চলো না...পাঁচ মিনিটে ব্যাক করে আসবে।"

হাত তার নিভৃত সমকামী বডিতে জামা গলিয়ে টিটোর সঙ্গে বেরোল।

বাইরু বাপির বাড়ির সামনে, ইন স্যাঙ্ক যেটা কিনা তার বাবা স্যাডো মোহনেরই বাড়ি, বেশ লোকজন জড়ো হয়েছে। তা সব মিলিয়ে জনা পঞ্চাশেক তো হবেই। একটা গোলচক্কর মতো হয়েছে মানুষের। কেন্দ্র থেকে বিলিতি বোসের কনফিডেন্ট গলা ভেসে আসছে, "একঙ্যাক্টলি কখন হয় ঘটনাটা?"

জটলার মধ্যে চেনা বলতে লোকেন সেন আর সঞ্জয় সোমকে দেখা যাচ্ছে। এঁরা দু'জনেই গাজার থেকে দিব্যছিলেন, থলে হাতে হুট স্ট্যাভিং মেরেছেন। ভিড়টা সরিয়ে এগোতেই হাফ একটা আজব সিন দেখে থমকে গেল।

বাপির বাইকটা শেখানো, আর বাপি সেটাকে জড়িয়ে ধরে উভাল কাঁদছে। স্যাডো মোহন পাশে দাঁড়িয়ে, একটু রাগী ও অপ্রস্তুত ফেস নিয়ে। আর একপাশে দাঁড়িয়ে বিলিতি বোস বাপিকে প্রশ্নটা করছেন। উত্তরে বাপি ঘিগুণ ডুকরে কেঁদে উঠছে। আজব এইসব নয়। আজব এইটা যে, বাপির বাইকের চাকাদুটো ছাড়া সব আছে! সওব! ফলে চেনা বাইকটাকেই কেমন একটা যোনামতো দেখাচ্ছে।

"আহা, কক্কালদে তো কোনও সমাধান পাওয়া যাবে না, বাপি। সামলে ওঠো। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।"

"বিলিতিবাবু কী বলছেন মন দিয়ে শোনো," একটু কড়া গলায় ইন্সাক্টর করলেন স্যাডো মোহন।

তাতে কাজ হল। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল বাপি।

"আমি রোজ সকালে উঠে ব্রাশ করার আগে বাইকের গায়ে জল দিই। ওর গায়ে জল না দিয়ে আমি নিজেকেও জল দিই না। আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ উঠে ঘুমচোখে জল দিতে গিয়ে দেখি বাইকটা স্ট্যান্ডেই দাঁড় করানো, কিন্তু চাকা দুটো নেই।"

"হুম। তার মানে কেউ খুলে নিয়ে গিয়েছে।"

এবার স্যাডো মোহন একটা জরুরি কোশ্চেন মারলেন, "কিন্তু বিলিতিবাবু, অনলি চাকা কি কেউ চুরি করবে?"

"করেছে যে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে মোহনবাবু! বাইক চুরি আকছার ঘটে। কিন্তু চাকা চুরি, অনেকের কখনও বাইক ছাড়া দুটো টায়ার বেচে যা লাভ, ওতে চুরির রিস্কটাও কিন্তু পড়তায় পোষায় না। সুতরাং এর পিছনে অন্য কোনও ব্যাপার রয়েছে।"

এবে আঙুল দিয়ে টোটের কোনাটা চুলকে নিলেন বিলিতি। আজ রাতেই দারুণ কুশিয়ল মোমেন্ট আসতে চলেছে। তার আগে এই আজব ব্যাপারে তিনি ডিপ দুশ্চিন্তা আমলাদি করলেন মাইন্ডের একেবারে চিলেকোঠায়। এ জিনিস সিরিয়াসলি তিনি আগে ফেস করেননি। বাইক আছে, টায়ার নেই। হাফ দেখল টিটো কখাটা ভুল বলেনি। দেখার মতো ব্যাপারই বটে। এই মোমেন্টে ভিড় ঠেলে মোড়ের মেকানিক গজানা ঢুকল।

"কই দেখি, কী হয়েছে?"

বলে সকলকে বেপাত্তা করে-টরে দিয়ে বাইকটা এদিক-ওদিক টিপে-টুপে দেখল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে একটা হৃদয় ফাটানো কমেন্ট ছাড়ল, "বুইলেন, টায়ার নিয়ে বাইকটা মজে বেঁচেছে। এ জিনিসে যে টায়ার সুদ্ধু চলছিল অ্যাদ্দিন, তাই না কত! কী খোকা, এবার একটা নতুন বাইক কেনো!"

বক্সাহত বাপির দিকে তাকিয়ে কথাটা বলল গজানা।

"নতুন মানে? এটা সারালেই তো হয়।"

"গজা মেকানিক যখন বলছে, তখন হবে না। বুইলেং বাইক কেনা! এরোপ্লেনের টায়ার এনে জুড়লেও এ গাড়ির ভবিষ্যৎ নেই। জুড়তে গেলেই বিপদ। আসি। আচ্ছা, ভেড়েশোটা টাকা..."

স্যাডো মোহন বিরিক্ষি নিয়ে ভেড়শোটা টাকা তুলে দিলেন বেপত্তোয় গজা মেকানিকের হাতে। ভেড়শোটা টাকা তুলেটা খানিক নিরুৎসাহ আর পাতলামতো হয়ে এল। যে যার কাজে সেরা আর কী। টোটের কোনা চুলকোতে-চুলকোতে বিলিতি হাঁটা দিলেন বিলিতি। ব্যাপারটা মোট ভাল ঠেকছে না তাঁর। চোখের জল মুছে দরজা দিল বিরহী বাপি। গুলিকে টিটোর কাঁধে হাত রেখে বাড়ি দিকে হাঁটা লাগাল তাজ্জব বনে যাওয়া প্রেমিক হাফ। কেবল এই ভুলুক্কুম ভালে একটা ব্যাপার কেউ পয়েন্ট করল না, এই জমায়েত থেকে একটা নাচু ডিসটেন্সে দাঁড়িয়ে, এই জুলুমু গরমে কালো ওভারকোট পরে গোটা ঘটনাটার ডিসপ্লে দেখল একটা অনজানা আদমি। সকলে ফেটে যেতেই সে গ্রাভস পরা হাতে একটা ফোন তুলে নিয়ে কার যেন নম্বর ডায়াল করল...

বিকেলের দিকে অনিমেষ ঘরের কোনও কাজ থাকে না। ইন স্যাঙ্কি, সকালের দিকেও থাকে না। আর দুপুরে তো কখাই নেই, ওটা ভদ্রলোকের কাজের সময় নয়। তবে হ্যাঁ, এই জানেমন শহরে জোনাকি সঙ্গে ঘনিয়ে এলে, তাঁর ডেলি কে ডেলি একটা কাজ থাকে বটে। বাড়ি ফিরে পেশেন্স খেলা।

এই তালে অনিমেষ ঘরের একটা মিহি ইন্টো না দিলে গলতি হয়ে যাবে। তিনি এই শহরের, নাম বিউটিফুল কলকাতার ইন্টেলিজেন্সের হেড। হেড না বলে হেলমেট বলা যেতে পারে, কারণ হেডের তুঙ্গেও যদি কোনও পোস্ট থেকে থাকে, তাহলে সেটা গুনার। যৌবন থেকেই এই লাইনে যেলছেন। সেই কবে যে গবমেন্টের পরীক্ষা-টরীক্ষায় পাস শানিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন এই ডিপারমেন্টে, তা আর অনিমেষের খেয়াল নেই। এখন যাট হয়েছে, বিশাল ফর্সা বপুর ডগায় একখানি ভারী ইনটেলিজেন্ট মাথা, আর সেযানে কেতায় রাখা জুলপির পাশে আলতো পাক ধরেছে। নরমপাক যাকে বলে আর কী।

তা এই এজে এসেও, বলতে নেই, ডগাডাঁই রকমের এফিশিয়েন্ট আছেন অনিমেষবাবু, এবং সেটা জানা আছে বলেই গবমেন্ট টন করে তাঁকে হাতছাড়া করতে চায় না। ভাল বাংলো, এস্তার কাজের লোক আর একটি ভিয়েতনামি শেফ মজিয়ে নিয়ে তাঁকে এই পদে ধরে রাখা হয়েছে। তাছাড়া তাঁর স্ত্রী সর্বমঙ্গলাও চান, বর যক্ষিন পারক আট্টিভ থাকুক।

তবে হ্যাঁ, সারাজীবন গবমেন্টকে অনেক সার্ভিস লাগানোর পরও যখন দ্যাখেন পারলিকে হেবি দুর্নাম যে সরকারি বুদ্ধিমত্তা টাইমে কাজ করে না, তখন তিনি ইচ্ছে করেই টাইমে কাজ করা ব্যাপারটা নিজিয়ে নিয়েছেন। করে হবেটা কী? সেই তো লোকের তিরছি নজরিয়া আর বিষবাক্য হজম লাগাতে হবে। তার চেয়ে ঘাট ভন্ডার হয়ে যাওয়ার পর নিজের সুবিধে বুঝে ওয়ার্ক করাই ভাল। তাই কাজ সারতে-সারতে এক-দু'দিন এদিক ওদিক হয়ে যায়। এমনিতেই যারা বোমা মারার তারা কেউ জানিয়ে মারে না, বাকি অন্যান্য কাজ কারবারে এক-দু'দিন লেট হলেও দেখেছেন অনিমেষ, কিছু যায়-আসে না। আজকাল ক্রিমিনালরাও গড্ড লেট লাগায়।

এমনিতে অনিমেষ ঘরের আন্ডারে বিরাআট টিম, ডগ বললে ডগ, ম্যান বললে ম্যান। তবে কুকুরদের একটা ভাল, প্রোমোশন দিতে হয় না। তবে কিনা এই যে এত লগাছাই একখানা টিম, কাজ তেমন কিছু হয় না। তার কারণ এই না যে কেউ কাজ করতে চায় না। কারণ এই যে, সরকারি ইন্টেলিজেন্সের কাছে কোনও কাজই নেই। বোকা-বোকা লোকজনকে শায়েস্তা টানতে কত আর ইন্টেলিজেন্স লাগাতে পারে? গুসব ছোট ছুটকাই ব্যাপার-স্যাপার পুলিশই দিব্যি ম্যানেজ মেরে নেয়। ফলে সকাল থেকে দুপুর হয়ে বিকেল, অনিমেষ ঘরের হাঁপুটানা বিরাট কেবিনটায় কাজের কোনও নামগন্ধ নেই। সারাটাদিনই তিনি পুরাতনী ক্রিমিনালদের কুখ্যাত ফাইল গুল্টান, আর ভাবেন, আহা, কী সব দিন ছিল।

যেমন এইমুহূর্তে তাঁর সামনে গুপেনিং মেরে পড়ে রয়েছে ১৯৮৬-র একটা ফাইল যেখানে মাকেসি-এর বিরাট ছবি। মেক্সিকোর এক কুখ্যাত আন্ডারওয়ার্ল্ড লিডার, যে '৮৬-র বিশ্বকাপের সময় একটা মারাত্মক ফন্দি এঁটেছিল। ফাইলটার কেচে কাকিয়ে থাকতে-থাকতে, কাজ নেই তো কোনও, স্মৃতিরিপিপ মোডে চলে গেসলেন অনিমেষ ধরা। এমনিতেই দুপুরে দনাদন বোমা মারার পর বিকেল থেকে তাঁর এট্টু ঝিমি-ঝিমি লাগে। একেবারে ঘুমিয়ে যাতে না পড়েন, তাই পুরনো ফাইল ঘাগেন। নতুন ফাইল বলতে গত টন বছরে এ আপিসে কিস্যু ঢোকেনি।

মাকেসির রোমহর্ষক কাহিনি তাঁর টপ চু বাটাম মনে আছে। মাকেসি ছিল অন্ধকার মেক্সিকোর রাজা। হিরে ব্যবসায়ী। কিন্তু ক্ষমতার লোভ তাকে তাড়িয়ে বেড়াত। সে দেশে অন্ধ আমলানি শুরু করে, একটা মোমেন্টের অপেক্ষায় দশটা তাগড়াই বছর স্পেন্ড মেরে দেয়। তারপর এল ১৯৮৬। মেক্সিকোয় ফুটবল বিশ্বকাপ। গোটা দেশ উগবগাচ্ছে। কিন্তু নিজের দেশ বিয়ে শুরু করলে ইবে না। তার অশান্তি শুরু হওয়া চাই আর। কোনও লাতিন দেশে। '৮৬-র ফাইনালের চেয়ে ভাল টার্গেট আর কে হতে পারে? আর্জেন্তিনা।

সে বহুর গোড়া থেকেই মারাদোনা ভগবান হয়ে বসে আছেন। পা ছুঁইয়ে দিলেই গোল্ড। সেই পা-ই তাঁর কাল হল। কোয়ার্টার ফাইনালের মহাই মারেসি বুঝে নিল, এই লোকটাকে কোনওভাবে ট্র্যাপ করতে পারলে আর্জেন্তিনা বিশ্বকাপ যোয়াবে। আর তেমনটা হলে আর্জেন্তিনা জুড়ে অশান্তি কেউ আটকাতে পারবে না। আর্জেন্তিনাতেও মারেসিসে হোল্ড কিছু শুভ নয়। দেশ জুড়ে আগুন জ্বালিয়ে দিতে তার দু'সেকেন্ড লাগবে। সেই আগুনের আঁচে মেক্সিকোয় গৃহযুদ্ধ, কারণ বহু ভাউন্ডে তৈরি হয়েছে আছে। তারপর সোওজা সশয় অভ্যুত্থান। ব্যাসা। কাজ হাসিল। ব্যাপারটা ভালভাবেই এগোচ্ছিল, সাকসেসও হয়ে যেত, যদি না সাত সমুদ্র পেরিয়ে এই কম্পিটিসিরি ডেট আনিমের ধরের বুকে এসে লাগত।

মারেসিসে ভাই ছাকেসি তখন ভারতে অপারেট করছে, মেনলি কয়লা আর বেশ্যায়। তার উপর নজর রাখার বেয়াদপ ডিউটি পেয়েছিল আমাদের এই অনিমেষ ধরের উবল ডিমাই কাঁধে। তিনি তখন দিনের মধ্যে ছাব্বিশ ঘন্টা ছাকেসিকে ফলো টানছেন। এমন মোমেন্টে নিউজ পেলেন, ছাকেসি তার দাদার স্পেশ্যাল ডাকে কলকাতা ছেড়ে মেক্সিকো টুনুনাচ্ছে। কেন? এই চরম কৌতূহলই সারাটা লাইফ ধরে অনিমেষের প্রোমোশনের কারণ হয়ে থেকেছে। তিনি ছাকেসির পিছন-পিছন মেক্সিকো অব্দি ফলো করে গেলেন, বাউন্সের ছদ্মবেশে। প্লেনে বোর হতে থাকা প্যাসেঞ্জারদের দু'-একপিস গানও নাকি শুনিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন খুব বেশি খামলার কাজে হয়তো বা ছাকেসিকে ডেকে পাঠানো হয়নি, তারপর দেখলেন ওমা! এ তো কাঁইনানা কেলেঙ্কারি! স্বয় মারাদোনার উপর অ্যাটাক ফলিয়ে গোটা দেশে সাম্রাজ্য বিস্তার। নেন এবং দেয়ার তিনি মেক্সিকান ইন্টেলিজেন্সের হাতে হাত-পাত মিলিয়ে ফাইনাল খেলার দিন সেডিউয়াম থেকে মারেসিস-ছাকেসিকে বেকায়দায় এনে ফেললেন। তাদের জেল হল অনেক বছরের জন্যে আর অনিমেষ ধর পেলেন মেক্সিকোর বিশেষ মেডেল। এখনও অনিমেষের নামে মেক্সিকোর সমস্ত বড় হোটেলের দরজা খোলা।

ফাইলের দিকে ল্যা-ল্যা করে তাকিয়ে অনিমেষ ভাবছিলেন, তারপর থেকে জীবনটা কেমন জলমারা বিস্কুটের মতো হয়ে গেল। তেমন-তেমন তাগড়াই অপরাধ যে ফাঁদবে, এমন জোরালো ক্রিমিনালও আর নেই। সবাই ডিরেক্ট পলিটিক্স জয়েন করে গিয়েছে। মেক্সিকো টু ইন্ডিয়া, অলা।

তবে বাইরে কাইম না হোক, বাড়িতে তাঁর ঝগরবিঁধ যাতিরে যাবার-সবার এখনও দুষ্মন্ত হয়, এইটেই যা ভরসা। অফিসে গামাচ্ছোরে বসে এপাশ-ওপাশ করতে-করতে অনিমেষ ধর দিনে অন্তত বার কুড়ি বাড়িতে ফোন করেন, কী-কী আইটেম রাতের টেবিলে জাম্প মারছে, তা জানার জন্যে। প্রথম দুটো কলের পর সর্বক্ষন্দা আর ফোন ধরেন না, ডিরেক্ট রাঁধুনিকে ট্রান্সফার করে দেন। গত টেন ইয়ার্স ধরে এমনটাই হয়ে আসছে রোজ। আজ যখনই শুনলেন মাছের মাথা দিয়ে পাঁঠার বুঁদিয়া আর আফগানি কীঝাঁদের ন্যাচ চাচনি, তখন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারলেন না। ছ'টা বাজতে না বাজতে অফিসের মেন গেট ঠেলে অনিমেষ ধরের ছমলো গাড়িখানা ধচার বাজিয়ে বাড়ির দিকে টার্ন খেলো।

রাতে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে শুইয়ে থেকে বসেই যা এট্টু বউয়ের সঙ্গে কথা হয় অনিমেষের। একমাত্র মেয়ে এখন আমেরিকায়, দু'বছরে একবার আসে। আজও মেয়ের কথাই হচ্ছিল। কিন্তু সংলাপ বিনিময় ঠপ করতে হল, কারণ তাঁদের ঘানসামা বিনোদ হঠাৎ এসে টেবিলের পাশে দাঁড়িয়েছে।

"কী ব্যাপার বিনোদ?"

"হুয়ে চিঠি কোই দেকে গয়া সাহাব।"

অনিমেষ সেই সর্বক্ষন্দার পর আর কারও সঙ্গে লাভ-ডাভ করার টাইম পাননি। এত রাত হাতে লেখা চিঠি কে পাঠাবে?

'কই দেখি' বলে হাত মুছে সাদা লেফাফাখানা তুলে নিলেন অনিমেষ। তাঁর নামে বেশিরভাগ চিঠিই অফিসে আসে এবং তাদের সবক'টাই সরকারি। এই চিঠিটা, খুলতেই দেখা গেল, হ্যান্ডমেড পেপারে কালির কলম দিয়ে লেখা। বড়-বড় হরফে যা লেখা সেইটা অনিমেষ হিন্দি মারতে পারলেন না, কারণ ভাষাটা তাঁর অচেনা। দু'-একখানা রোমান হরফ আছে বটে, কিন্তু তা দিয়ে মান উদ্ধার করা যাচ্ছে না। অবিশ্যি নিচে ফ্রেঞ্চ বা ইতালিয়ান মাথাবরানো সিনেমাগুলোর মতো ইংলিশ সাবটাইটেল আছে, সেটা হাতে লেখা নয়, টাইপ করা। যার বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'তুমি আর তোমার লোকজন যদি ভুলেও আগামী শুক্রবার রাতে শালিমার শিণ্ডইছাটে যেও না। আমরা আসছি। তুমি এলে তোমাদেরই বিপদ। ক্ষয়ক্ষতির লগ আমরা নেব না।'

ব্যাপারটা বুঝতে কিছুক্ষণ সময় লাগল, তারপর আচ্ছিদে আবার একটা হুমকি চিঠি পেয়েছেন বুঝতে পেরে টেবিল ছেড়ে প্রায় লাফিয়েই উঠলেন।

"উঃ, মঙ্গলা! আজই ভাবছিলাম, চেয়ার ছাড়ার আগে একটা ভাল কেস পাব না? এইরকম একটা সাদামাটা রিটায়ারমেন্ট হবে? উফ্! আজই দেখো, এই চিঠি। য়েট করেছে, য়েট! ভাবতে পারছ? কব্বিন বাদে কেউ য়েট করল আমাকে? তাদেরও লেখিয়ে দিতে হবে, অনিমেষ ধর বাঘের বাচ্চা! কী বলো?"

"তুমি একদম এসবের মধ্যে পা দেবে না বলে রাখলাম। যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, দৌড়ে বেড়ানোর দিন আর নেই। জুনিয়রদের বেলা বুঝে নিতে। তুমি অফিসে বসে ইন্ট্রাকশন দাও। ফিল্ডে আর তুমি যাবে না, ব্যাস।"

"জিঙ্গ মঙ্গলা, এটা যে-সে ব্যাপার নয়। দেখছ না, বিদেশি ভাষায় হুমকি? ইন্টারন্যাশনাল কেস পুরো। আচ্ছা বিনোদ, কখন লায়া ইয়ে দেউার?"

বিনোদ মাথা চুলকে আনসার মারল, "জি ও তো হামনে দেখা নেহি।"

জবাব শুনে অন্য যে কেউ স্বস্থার্থই হয়ে উঠত, অনিমেষ ধর ভবল খুশি হয়ে পকেট থেকে দুশো টাকা বের করে বিনোদকে বশখিশ দিয়ে বললেন, "ওয়েল ডান মাই বয়। অবেথা শব্দর সঙ্গে লড়েই তো মজা!"

সেম রাতে বেহালা অঞ্চলে কী-কী ঘটছে সেটা একবার ঝালিয়ে না নিলে নভেল এগোবে না। বেস্পতিবার, সেমি অন্ধকার। সাড়ে ন'টা নাগাদ এই হুন্ডি গরমের মধ্যে কতুয়ার উপর কালো শাল চাপিয়ে দেদার ঘামতে-ঘামতে এলাকা লিভ করলেন বিলিতি বোস। বুকপকেটে সেই কুড়িয়ে পাওয়া চিরকুট। বারে রিলিস না করলে অন্যায় হবে যে-চিরকুটটা এসেছিল তাঁর এমপ্লয়ার এজেন্সি টপ প্রাইভেট থেকে। এজেন্সি-র মাথায় যে-মহিলা বসে আছেন, কখনওবার হেডকোয়ার্টার মিন অপারেট করেন, সেই ম্যাডাম বি নিজে হাতে সই করে পাঠিয়েছেন। জরুরি ভলব, কাজ আছে। ঠিক যে-মোমেন্টে নিজের ও জীবনের কেন্দ্রবিন্দু উপর সব আঁধার ছেড়ে দিয়ে বিলিতি হতাশায় ডাইভ দিচ্ছিলেন, সেই মোমেন্টে এই চিরকুট তাঁকে নিউ লাইফ দিয়েছে। কাজটা কী, জানার জন্যে তর আর সইছে না। তবে কাজ যা-ই হোক, এই বয়েসে, আনিমা আউট অফ প্র্যাকটিস থাকার পর, একলা-একলা কিছুই হ্যান্ডল করতে পারবেন না। তাই তাঁর একান্ত উইশ, অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবেন। টফি দে ছাড়া সেই আরাসী রোলে কে-ই বা ফিটিং মারতে পারে?

সুতরাং পাড়া ছেড়ে যাবার মোমেন্টে গজা মেকানিকের লোকানের সামনে থেকে ম্যাম্বা মারে দাঁড়িয়ে থাকা টফি দে-কে কালেক্ট করে নিলেন বিলিতি বোস। টফিকে অবশ্য চাদর পরতে হয়নি। চাদরটা বিলিতির জন্যে ম্যাচ। সিনিয়র এজেন্ট, কাজে যাচ্ছে, গা ঢাকা দিয়ে যাওয়াটা কোড অফ কন্ডাক্টের নাই, সেই তার মুখে পড়ে আর কী।

এইখানে বলা দরকার, এই ম্যাডাম বি কী জিনিস। যে-সব এজেন্টের সঙ্গে তিনি মিট করেন না, কারণ তিরিশ বছর ধরে হেডকোয়ার্টারের টপ দায়িত্ব দু'হাতে বোঝেন তিনি। বয়েস বহুর আটাত্তর হবে, কিন্তু আঠাশ করে রাখার একটা মিহি বাসনা সারাক্ষণ শরীল থেকে ছলকাচ্ছে, নকল ভাবে চরম খারাপ কথা বলতে পারেন, মুখে হাসি নিয়ে টোটাল নির্মমতা করতে এক সেকেন্ডও লাগে না ম্যাডামের। কথা মিনস কথা।

এহেন বারমুডা ট্রাঙ্গল মহিলার সঙ্গে সেই গোড়া থেকেই কিন্তু বিলিতি বোসের একটা লাভ অ্যান্ড হেট রিলেশন। ম্যাডামকেও উপরের ইন্ট্রাকশন শুনতে হয়, সে কারণে অনেক সময় অনেক বিপদের মুখে বিলিতি বোসকে তিনি এমন ভাবে ঠেলে দিয়েছেন যেন তাঁর খুবের ভিতর ছলছের জায়গায় ব্যাঙ্গির বল রাখা আছে। আবার এমন-এমন ক্ষেত্রে বিলিতির ভুল-ভ্রান্তিকে টোটাল আড়াল করে দিয়েছেন যে ব্যাঙ্গির বলটা বুকপুকু করে উঠেছে।

তবে হ্যাঁ, মোটের উপর বিলিতিকে ম্যাডাম মনে-মনে লাইক মারেন, এটা বিলিতি বুঝে নিয়েছে। তবে অফিসে এখুনি টফি দে-কে ঢোকানো যাবে না, রাস্তাতেই তাকে দাঁড়িয়ে থেকে করতে হবে। সে করুক গে। বিলিতি বোসও তো তাঁর হাইফাই কেরিয়ার রাস্তা থেকেই স্টার্ট মেরেছিলেন।

শখেরবাজার ছাড়িয়ে একটু দূর যেতেই ডায়মন্ড হারবার রোডটা বেমন

যেন বাড়ির খযাতে ছেলে টাইপ হয়ে আসে। ছিরিষ্টীর নেই, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে লেকানপাট, তার উপর মহামতি মেটোর কাজ শুরু হয়ে এলাকা এতবারে জাঙ্গড়াঙগাই হয়ে বসে আছে। এইরকমই একটা লবেজা হাফ আবয়া স্পটে একটা লবকাড়ে লোতলা লেকান। যুপড়ি, নোংরা, টিমটিমে। সাহা অপটিস। একতলায় একটি শোকেস, তাতে গান্ধীজির আমলের কিছু ফ্রেম সাজানো, সেগুলোর উপর ওই গান্ধীজির আমলেরই হুলো সেডল কারে গিয়েছে। শো কেসের ওপারে এক যোনামারা ভতলোক বসে, ওই গান্ধীজির আমলেরই। শুধু ওঁর হাতে যে নিউজ পেপার, সেটা বশ্ব বছর পুরনো জাস্ট।

কোনও ইনটেলিজেন্ট আদমি এই লেকানে ঢোকে না। আর বোকাদের অত টাইম নেই। ফলে মাল পুরো সাপ্লাচার সকেটে এই লেকানেরই লোতলায়, যেখানে নাকি চোর দেখার জন্যে শিক্ত শ্ট একজন বৃদ্ধ ডাক্তার বসার কথা, সেখানেই ম্যাডাম বসেন। কলকাতায় এমন বহু লেকান তাঁর বানানো আছে, কোনও কথা হবে না।

'তুই এখানেই দাঁড়া' বলে তাজ্জব বনে যাওয়া টসি দে-কে বাইরে দাঁড় করিয়ে বিলিতি বোস যখন লেকানের ভিতরে পা রাখলেন, যোনামারা লোকটি তখন সবে টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের খবরটায় ডুব দিচ্ছেন। নো কথা, জাস্ট চাউনির মাধ্যমে কাজ হল। ভতলোক তাকালেন, তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ঝুমঝুমি বের করে শো কেসের উপরে রাখলেন। এটা, বলতে নেই, গান্ধীজিরও আগের আমলের। বাবর-টাবর হবে। সঙ্গে-সঙ্গে কায়দার হাসি ঠাঙিয়ে বিলিতি বোস চার মেলে ধরলেন, তাঁর ফতুয়ার পকেটে একটা গোলাপ গোঁজা। রেড, ন্যাতানো। ব্যাস, কোড ডেরিফায়েড। এবার ছিনিমিনি সিঁড়ি বেয়ে লোতলার সেই ঘরটায় উঠে গেলেন বিলিতি, যেখানে স্ট্রেট শীড়ালে মাথা ছাদে ঠেকে পলেস্তারা-বৃষ্টি হয়।

ম্যাডাম আজ সেজেছেন। কতদিন পর ম্যাডামকে ফেস করছে বিলিতি। কায়দা করে একবার শেকের দেনা হ্যান্ড বাড়াতেই বুঝলেন, মুড ভাল নেই। চোখের ইশারায় সামনের চেয়ারে তাঁকে বসতে বললেন ম্যাডাম। চুল কেটেছেন। মাথার। ঘাড় অব্দি কেটে ব্রাউন-ব্রাউন রং মেরেছেন তাতে। খারাপ দেখাচ্ছে না। গলায় মুক্তোর মালা, সঙ্গে একটা গ্ল্যাডিনামের চেন। সে চেন গভীর থেকে আরও গভীরে লাট যাচ্ছে, কারণ আজকের টাইট জামাটা অনেকদূর খেলিয়ে তবে শুরু হয়েছে। খাঁজের দিকে এক-দু'বার যেতে যাওয়া অ্যাডামেন্ট নজরকে কয়েদ করে একটা শুকনো হাসি পেশ করলেন বিলিতি।

"অনেকদিন পর, ম্যাডাম, ভাল আছেন?"

"তুমি ফিট?"

"একদম। রোজ জগিং আর এক্সারসাইজের উপর আছি।"

"হুম। মিশনে যেতে পারবে?"

"রামকৃষ্ণ মিশন?"

কোশ্চেনটা ঝেড়েই বিলিতি বুঝলেন ছড়িয়ে জাস্ট লাট করেছেন। সামলানোর চেষ্টায় বললেন, "জোকিং ম্যাডাম। কব্দিন পর দেখা। যা-ই হোক, বলুন।"

"কুশিয়াল মিশন। যেতে পারবে?"

"এনিটাইম ম্যাডাম। আমি রেডি।"

"পাসপোর্ট রেডি আছে?"

আয়েশে বিলিতির চোখদুটো ক্লোজিং হয়ে এল। তিনি দেখতে পেলেন মরক্কোর এ গলি, সে গলি, লাল বনেট দুলিয়ে ছ্যাগ ডিলারদের তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। সেখান থেকে সোজজা ছুটতে হচ্ছে মাদ্রিদ, কারণ এরা একটা মিসাইল লঞ্চ করতে চায়, যার কোড মাদ্রিদের একটা হোটেলে রাখা আছে। সেখানেই শেষ নয়। কুচক্রীদের স্টেনগানকে চুব্ধি খাইয়ে প্রাইভেট জেট নিয়ে স্ট্রেট ইস্তানবুলে। সেখানে ভিড় ভাড়াক্কার বাজারে এক বিরাট সাইজের দামড়াকে চেঙ্গ, কারণ সে একমাত্র নিয়ে যেতে পারে মিসাইলের ডেটায়। এরই মাঝে হাভানার এক রাতে বিস সাইডের এক হোটেলে শত্তর বাগদত্তার সঙ্গে উশখুশু হকাচাই মিশন ছিল, ওটা এডিচ করলেন বিলিতি। জেসমিন তো জেসমিন। স্বপ্নেও অন্য নারী নয়। চোখদুটো ক্লোজই থাকত, যদি না ম্যাডাম আর-একটু কড়া গলায় আবার কোশ্চেন রাখতেন, "পাসপোর্ট রেডি আছে?"

"অবশ্যই ম্যাডাম।"

"ওকে। লাগবে না। আলমারিতে রেখে দাও।"

বিলিতির টপ টু বাটাম ফুলসে বাদাম হয়ে গেল।

"লাগবে না? তাহলে?"

"কলকাতার আশেপাশেই মিশনটা কালমিনেট করবে। সম্ভবত শালিমার শিপইয়ার্ডে।"

"অ।"

বিলিতি এখনও টুমা থেকে বেরোতে পারেননি।

"মন দিয়ে শুনছ?"

"একদম, একদম ম্যাডাম। আপনি বলুন। চুরির কেস?"

"অনেক বড় ব্যাপার। রাশিয়ানরা ইনভলভড।"

"রাশিয়ানরা? শালিমার শিপইয়ার্ডে?"

"কেন? রাশিয়ান সাবসি সিঁধির মোড়ে চলে না?"

এই দুষ্ট বুদ্ধির মুখে বিলিতি সাইলেন্স মারলেন।

"মিশনটা কিন্তু সত্যিই খুব বড় মাপের। এরা তেলের সন্ধানে এখানে আসছে। থোবে কি পাবে না। সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু ভিতরের খবর, গোটা কলকাতাকে চাইলে উড়িয়ে দিতে পারে।"

"কিন্তু ম্যাডাম, আমি তো যকুর শুনেছি, রাশিয়ানরা রান্নায় তেমন তেল ইউজ করে না। ওদের ওখানে ফুরিয়ে গিয়েছে।"

আবার একটা ডিপ সাইলেন্স যা বিলিতিকে বুঝিয়ে দিল, আর কোশ্চেন নয়।

"কলকাতায় আসছে একটা অতি সক্রিয় উগ্রবাদী দল। যারা-যারা এই দলের সদস্য, প্রত্যেকে ডেঞ্জারাস। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত এবং প্রযুক্তির দিক থেকে চূড়ান্ত উন্নতমানের লোকজন। মিশনটা বুঝে নেওয়ার আগে এদের ব্যাকগ্রাউন্ডটাও একটু জেনে রাখা ভাল। সোভিয়েত যখন ভাঙে, এরা সব দিক থেকেই সুযোগ নেবার তালে ছিল। সরকারের কাছ থেকে, আবার বিদ্রহী, বিরোধীদের কাছ থেকেও। নিচ্ছিলও, কিন্তু কিছুদিন পর যখন গোটা রাশিয়া জুড়ে চূড়ান্ত অরাজকতা চলতে থাকে, এরা অল্পের আর ক্ষমতার মাধ্যমে তার ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। এরা একসময়ে চেচেন জঙ্গিদের সঙ্গেও ডিড়েছিল, কারণ অ্যাজ ইউ নো এজেন্ট বোস, এই দুনিয়ায় তেল যার মুলুক তার। কিন্তু শেষমেশ চেচেনদের সঙ্গে এই উগ্রবাদী দলের বনিবনা না হওয়ায় তারা বেরিয়ে আসে। ক্ষমতার লড়াইয়ে চেচেনদের কাছে এরা হার মেনে নেয় ঠিকই, কিন্তু তেলের লোভটা ছাড়তে পারে না। এদিকে বেরিয়ে আসার পর ইউক্রেন সরকার তাদের মেনে নেয় না। তাদের নামে ইনিয়া জারি করে। ফলে এদের অবস্থা হয় না ঘরকা-না ঘাটকা।

বিলিতি বোস শুনছেন আর ভাবছেন এতকিছুর পরেও তাঁকে শালিমার যেতে হবে। তাঁর সসটসে চোখের দিকে না তাকিয়ে একটা ফাইলে মুখ সিংকিং করে গোটা ব্যাপারটা আউড়ে চলেছেন ম্যাডাম বি।

"এরা তেল করে কী, দেশের বাইরে তেলের সন্ধান চালাতে থাকে। কিছু উপসাগরীয় আন্ডার ওয়ার্টার পাইপলাইন ট্যাপ করার চেষ্টা করে, পারে না। মার্কিনরা গুঁটা বাপের বাড়ি করে রেখে দিয়েছে। এমন সময়ে কেউ একজন একটা খবর দেয় কলকাতার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে তেলের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। ইন স্যাক্ট, ব্যাপারটা খুব মিথ্যে নয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে এরকম একটা খবর বেরিয়েছিল বটে। কিন্তু এরা এমন এতটাই মরিয়া হয়ে গিয়েছে যে অপেক্ষা বলে কিছু আর নেই। যেখানে তেল, সেখানে বোম।"

"তা এরা কলকাতায় কি ডিলার নিয়ে আসছে?"

"আমাদের কাছে গোপন সূত্রে যা খবর, তাতে তিনটে রকেট লঞ্চার, চার বাক্স গ্রেনেড, পঁচিশ পেটি ডায়নামাইট আর অসংখ্য মেশিনগানের পাশাপাশি তিনটে বড় ডিলার রয়েছে বইকী।"

"তা এদের কী প্ল্যান?"

"সিম্পল। এরা তো সরকারের সঙ্গে কোনও ডিলে যাবে না, সেটা এদের সাইলেন্স নয়। আর ভারত সরকারই বা কেন নিজের তেল নিয়ে রাশিয়ান উগ্রবাদীদের সঙ্গে ডিল করবে। তারা তো আর আমেরিকা নয় আগডাম অলি। তাই জোর খাটাবে। ইজি ওয়ে। টেরর সয়াম। সাকসেসফুল হলে তেলের লাইন বুঝে নেবে, আমরা আঙুল চুষব। আর কী।"

"সরকার জানে?"

"সরকার তো সবই জানে, কিন্তু কিছুই জানে না। আমাদের এজেন্সি খবরটা গত পরশু পেয়ে অপারেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

"সরকারকে জানিয়ে?"

"সেটা কখনও সম্ভব? তুমি তো জানো সরকারের সঙ্গে এক সময়ে আমাদের ওঠাবস ছিল। তারপর আস্তে-আস্তে আমাদের মেখড আর ওদের ভাবনাচিন্তা আলাদা হয়ে যাওয়ায় ওরা সাপোর্ট তুলে নিতে থাকে। এখন তো এজেন্সি আন্ডার সিজ।"

"তাহলে?"

"তাহলে তো ডিউটিকে অবহেলা করা যায় না এজেন্ট বোস।"

"তা তো বটেই।"

"সুতরাং আমরা আমাদের মতো করে একটা ট্রাই নেব। এস্পার নয় ওস্পার। হারলে লজ্জা নেই। জিতলে সরকার আবার আমাদের সার্সেস করতে বাধ্য।"

"আচ্ছা। কোন-কোন এজেন্ট থাকছে?"

"কোন-কোন মানে আবার কী। তুমি, এজেন্ট বোস।"

ব্যাপারটা নিশ্চিত হবে গৌরবের, কিন্তু সেটাকে কিছুতেই নিজের আন্তরস্যাভিভ-এ নিতে পারছেন না বিলিটি। এই জাগরীকুম্পাই মান তাঁকে একা হাতে হ্যান্ডল করতে হবে, ভাবলেই একটা ঠান্ডা স্রোত খেলে যাচ্ছে। মেনলি পিঠে।

"একেবারে একা?"

"একেবারে একা। এখন বাকি এজেন্টদের তুলে নিতে হয়েছে, ফাভিং পুশ্ত। তুমি পুরনো লোক, তোমার ওপর এটুকু ভরসা আমি করতে পারি।"

এই ডায়লগে বিলিটি বোসের ওস্তাদ গর্ব চিল্ল করার কথা, কিন্তু ফিল করতে পারছেন না। অনেক ভেবেচিন্তে একটা কোশ্চেন মারলেন তিনি।

"ম্যাডাম, মানে, সঙ্গে আর্মস থাকছে তো?"

"সরি এজেন্ট বোস। সরকারি কারণে এখন আমাদের সমস্ত আর্মস সিঙ্গড।"

"তাহলে?"

"বুদ্ধি এজেন্ট বোস, বুদ্ধি। ওর চাইতে বড় অস্ত্র পৃথিবীতে আজ অব্দি আবিষ্কার হয়নি।"

বিলিটি এবার চোখ আধো ক্লোজ মেরে দেখতে পেলেন, তিনটে রকেট লঞ্চার, চার বাঁয় গ্রেনেড, পঁচিশ পেটি ডায়নামাইট আর অসংখ্য মেশিনগানের সামনে টিনি ফেস বুদ্ধি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পাশে ন্যাম্বাইনো টফি দে, তার বুদ্ধি শাউন্ট না করাই বেটার।

"ঠিকই বলেছেন ম্যাডাম। কিন্তু ওদের ওই টিমের সামনে একেবারে খালি হাতে যাওয়াটা একটু ঝিস্ক হয়ে যাবে না?"

"একটু ব লাইফ রিস্ক এজেন্ট বোস, লাইফ রিস্ক। আর সেইজন্যেই তো আপনি আন্ডার কাভার গ্রেনেড। নাহলে তো পুলিশ হতেন, তাই না?"

বিলিটি নীরব হেড লেলালেন। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নিজের একক্রিস্টেন্সের অপোজিট ডিরেকশনে চলে যাচ্ছে বুঝেও চুপ করে থাকতে হল। এখানে অবশ্য টফি দে-র কথাটা বললেন তিনি, এবং অ্যাপ্রভালও পেয়ে গেলেন বাড়াংসো নামি-নামি করছেন যখন, ম্যাডাম তাঁর নরম হাতটা বাড়িয়ে শেকের জন্যে দিয়ে আলতো হেসে বললেন, "বেস্ট অফ লাক।"

বাইরে ল্যাম্প-পোস্টে হেলান মেরে টফি দে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মোবাইলে হারু সাইলেন্সলি ভাইব্রেট করে গিয়েছে বার সাতেক, সে টের পায়নি।

"কী কেস এবার তো বলো!"

বিলিটি নেমে আসার পর আবছা অন্ধকারে তাঁর আমড়া হয়ে যাওয়া মুখ ঠাহর করতে না পেরে নিজের কৌতূহল দেগে দিল টফি।

"দারুণ একটা মিশন আসছে সামনে, তৈরি থাক। তুই আমাকে জয়েন করছিস।"

"সিরিয়াসলি?"

"সিরিয়াসলি।"

রাতের বেহালা সামান্য বেসুরো বেজে উঠল, আর তার কাঁপতে থাকা ছড়ের উপর হেঁটে-হেঁটে রাস্তা পার হল এই দুই ক্যারেক্টার।

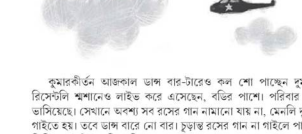

কুমারকীর্তন আজকাল ডাঙ্গ বার-টারেও কল শো পাচ্ছেন বুমাস্কুমা রিসেন্টলি শ্মশানেও লাইভ করে এসেছেন, বডির পাশে। পরিবার কেঁদে ভাসিয়েছে। সেখানে অবশ্য সব রেসপেক্ট গান নামানো যায় না, মেনলি বুংযের গাইতে হয়। তবে ডাঙ্গ বারে নো বার। চুড়ান্ত রসের গান না গাইলে পাবলিক পিটিয়ে ঝর্জুলীল বানিয়ে দিতে পারে।

আজ শহরের বাইরে একটা থিঙ্গিমতো লাইটিং মারা বারে কল শো। মালকড়ি ভাল দিচ্ছে। তবে বিনা ফার্স্ট আইটেম। তাঁর হয়ে গেলে কোন এক মহিলা স্টেজ লেলাবে। আজ আবার তাঁর গোটা টিমের পাশাপাশি টিমটিম করে জ্বলছেন ইংলিশ লোকেন সেন। তিনি এত শুনেছেন এসবের কথা, কিন্তু লাইভ কক্সন কখনও ন্যাখেননি।

এসে থেকে পরিবেশে দেখে অবশ্য চুপ মেরে গিয়েছেন লোকেন সেন। এখানে ইংলিশ কেন, কোনও ভাষাই ঠিক খাপ খাচ্ছে না। সঙ্কে সাড়ে সাতটার মধ্যেই টেবিলে-টেবিলে বডি পড়ে আছে। মধ্যেমধ্যে ঝাঙ্গড় নিয়ে উঠে লো খুঁত পিছে নিচ্ছে, আবার টেবিলে মাথা দিয়ে ডাউন। এরই মধ্যে কুমারকীর্তন অবলেনায় স্টেজ নিলেন। সঙ্গে সুস্নার কনসিডেন্ট টিম।

গানগুলো গাড়িতে আসতে-আসতে ভেঙ্গে রেখেছিলেন মনে-মনে, একের পর এক ছাড়তে হবে, যেমন ডুবো তেলে মাখো-মাখো পেঁয়াজি ছাড়া হয়। প্রথমেই শৃঙ্গার রসের সং, রাধাভাব নিয়ে। এক সময়ে 'রাধা হো হো হো হো হো হো হো' খুব হিট খেয়েছিল। সে হিট এখনও নামেনি। তারই আলেল তৈরি 'রাধা গো গো গো গো গো গো' দিয়ে আসর শুরু করলেন কুমারকীর্তন। মিনিটের মধ্যে লাট যাওয়া কাস্টমারগুলো উঠে বসে বগল চাবকাতে লাগল। কোনও কথা হবে না। উব্জেজনা যখন কেবল তুঙ্গেই নয়, রণতুঙ্গে, তখন আর-একটা সেমি শৃঙ্গার ধরে বসলেন কুমারকীর্তন। 'হাওয়া হাওয়া, ও হাওয়া, খুশখ্ দুলালে'-র সুরে 'কানাই কানাই, ও কানাই, বোলো রাধাকে'। লাঠ চালু।

এইরকম যখন অবস্থা, তখন কুমারকীর্তনের একটা ট্রাঙ্গ আসে। চোখ বন্ধ-ফন্ধ করে সিম্পলি অন্য জগতে ডাইভ মারেন। কিন্তু বিস্ময়ে চড়াং হয়ে যাওয়া লোকেন সেনের দৃ'চোখই তো টানটান। সেই চোখেই তিনি দেখলেন, আটটা নগাপ বারের দরজায় গদাম মেরে একদল লোক ভিতরে ঢুকল, ছ্যানামারা মুখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ষ্ট্রেট বাঁকানো সিঁড়ি বেয়ে নরকের দিকে উঠে চলে গেল। তাদের একজনের গামাসাইক্ল কোমরে, খেয়াল করলেন লোকেন সেন, পিস্তল গোঁজা আছে।

ছোটা মহেন্দ্রর আজ মেজাজ হেবি ভাল। আগামীকালই বড় কাজে হাত, সুতরাং মুড ডিগির্ডাই। নিজের বাছাই বিয়ানায় বসল ছোটা মহেন্দ্র। বনা-মনা তার দুটো গাল-পা নিয়ে রামটিপুনি আরম্ভ করতেই বিলকিস বেয়ারাকে ডেকে দু' পীট্টে রাম আর চিকেন তন্দুরি অডরি ঝেড়ে দিল।

"যেলটা কেমন যেলেছি বেলো বস?"

খুব একটাই ক্রেডিট গলায় টেনে কোশ্চেনটা লাগাল বিলকিস।

"যেলেছিস তো কেয়া বাত বেটা, কিন্তু এখনও আমার সিমাগে একটা কেস ক্লিয়ার হল না।"

"কোন কেস বস?"

"তুই যামোনা ওই ছোকরার বাইকের টায়ার খুলে নিয়ে এলি কেন? ও সালা তো আবার নতুন টায়ার লাগিয়ে নেবে। আর টায়ার খুলে লাভই বা কী?"

"দেখো বস, আমার মক্কলরার ব্যাপার বেড়ে দিচ্ছে, তাতে ওই ছোকরার সঙ্গে সালা ওই লড়কির ইশক শুরু হয়েছে। আর দু'জনে বাইক চড়ে হেবি ঘোরে। কাল জম্মু আমরা লড়কিকে কিডন্যাপ করব, আগে তো ওই লড়কা পিছা করবে। তারপর বাপ। তা বাইকের টায়ারই না থাকলে পিছা করবেটা কী দিয়ে? ও মডেল আমি দেখে লিয়েছি, কারও লম নেই টায়ার লাগিয়ে দেয়।"

"জিও বেটা জিও। আর বাপও সে-ও তো ফলো করবে?"

"বাপটা সাউন্ডপ্রুফ কামরায় থাকে, বুঝলে না।"

"বাস। তুই আমোকে শান্তি দিলি রে বিলকিস। কাল কাজটা মেরে নিয়ে আয়, তারপর ভোরবেলা ওর বাপ একটা ফোন পাবে। দু'দিনে মামলা ফিনিশ। লড়কি ফির বাড়িতে আর আমরা আসমানে।"

"একদম বস।"

এদিকে নীচে অন্য সিন চলছে। কুমারকীর্তন তার লাস্ট সং গাইছেন, 'ডিস্কো দিওয়ানে...আহা!'-র সুরে তাঁর কম্পোজিশন, 'কৃষ্ণচরণে...মাথা!' লোকজন বোতল গেলাস উল্টে নেচে জাপুনাচাস হচ্ছে। গান শেষ হওয়ার পর সেলফির ড্যাপাচাপিতে কুমারকীর্তনের প্রাণ যাওয়ার জোগাড়। লোকেন সেনের সব শার্টই একটু ছোট সাইজের, তাই গর্বে বুক ফুলে টনটন করছে বোতামগুলো। এইরকম গায়নদার তাঁর জীবনে প্রাইভেট বন্ধু হিসেবে অবতরণ মেরেছে, এই ভেবেই তিনি ষ্ট্রেট কৃষ্ণকে বনাবার দিলেন মনে-মনে। অবশ্যই ইংলিশে।

সব সেরে-টেরে ঘোল-কত্তাল প্যাক করে উইথ চিম কুমারকীর্তন স্টেজ থেকে আনমনে নামতে যাবেন, এমন সময়ে নরম কী একটার সঙ্গে ধাক্কা খেলেন। তাকিয়ে টের পেলেন, মহনার বাঁকিকের বুক। যেটার তলায় হাট আছে। বুকে বুক লেগে যাওয়ার পরেই চোখের সঙ্গে চোখ হল, তাতে আবেগের চরম ফোলানো ধিক ক্রাস্ট, তার উপরে কামযাইখাই-এর এক্সট্রা টফিং ঝুরঝুর করছে। একটা মোমেন্ট যেন মহাসাগর পেরিয়ে চলেছে তো

চলেছে...

"আপনি খুব ভাল গাইলেন।"

কথাটা যে-টানে ভাসিয়ে দিল ময়না, তাতে কুমারকীর্তন 'ধ্যা' অবধি বলতে পারলেন। স্বস্ন'টা তলপেটে পৌঁছে গেল। বহুদিন পর নিজের তলপেটে দিব্য করলেন কুমারকীর্তন।

বাকি সিন ফেরার পথে, টাটা সোমু গাড়ির ব্যাক বেঞ্চে। জানলার বাইরে গিজির্তাই মার্কা উদাস চাউনি নিয়ে অন্ধকার দেখছেন কুমারকীর্তন, পাশে বসে এখনও মুগ্ধতা মারাচ্ছেন লোকেন সেন। এখন অব্দি কেউ কোনও কথা বলেননি। দু'জনেই টপ ট্রাল্পে বিভরণ লাগাচ্ছেন, অবশ্যই আলাদা-আলাদা কারণে।

অনেক হাইওয়ে-হাওয়া খেয়ে নেওয়ার পর মুখ খুললেন লোকেন সেন। ফুল বোলায়।

"আপনি খুব ভাল গাইলেন।"

এটারই অপেক্ষা ছিল। কুমারকীর্তনের প্রাণ ফিরে পাওয়া তলপেট থেকে ঢনাৎ করে একটা আনসার ভেসে উঠল,

"স্বস্ন!"

লোকেন সেন ওয়ার্ডেল মিনিংটা ঠাহর করতে না পারলেও, গায়ে মাখলেন না। কুমারকীর্তন তখন অন্য প্ল্যানেটে মন বেঁধে বুঁদনা হয়ে আছেন। তাঁদের ক্যারি করে একটা ডাউন টাটা সোমু রাতের হাইওয়ে চিরে কলকাতার দিকে চলেছে।

বড় বেনামায় রাত আজ নেমে এসেছে শিল্পী সঞ্জয় সোমের বাড়িতে। ছিলেন ছিলেন ভাল ছিলেন, হাসপাতালে বউ এসে ইমোশানে টকবার লাগিয়ে চলে গেছে মনটা বেন আরও মুষড়ে পড়েছে। বিকেলে নিজের বানানো জঙ্ঘন্য চা খেলেন না, সন্ধেবেলা সামান্য যে-সময়টা পৃথিবীকে দর্শন নেন পাড়ার মোড়ে পীত খুঁটে, সেই সময়টা ইজিচেয়ারে উপুড় হয়ে কাটালেন। কেমন যেন হয়ে গেলেন কয়েক মোমেন্টের মোলাকাতে। নতুন করে আঞ্জার পেলেন, মেয়েটাকে তিনি কত ভালবাসেন। মনে-মনে নিজের বউকে লুকিয়ে মেয়ে ডাকতে তাঁর মন্দ লাগে না। চেয়েছিল কেবল একটা সুখের সংসার, তা-ও তিনি তাকে দিয়ে উঠতে পারলেন না। শিল্পের সাধনার কাছে জাগতিক সুখকে মাথা নোয়াতেই হয়। তাই না? প্রশ্নটা তিনি নিজেকেই করলেন এবং নিজেই উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

এই সময়ে তিনি সিল করছিলেন, কতখানি টেরিবল ভাবে একলা তিনি। একজন বন্ধু বা ভক্ত যদি রেজ়ের মধ্যে থাকত, তাহলে এই কোন্সেন্ট তাকে করে তার মুখ থেকেই উত্তর পেয়ে সান্ত্বনা কুড়িয়ে লাভ্ হওয়া যেত। নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলতে হত না এভাবে। তবে বিনা, আবারও ওই নিজেকেই বোঝালেন সঞ্জয় সোম, শিল্পীদের ভবিতব্যই একা হয়ে যাওয়া। বিশেষত যারা তাঁর মতো টপ শিল্পী। দুনিয়া তাদের বোঝেনি, কেবল তাদের কাজ নিয়ে পাগলের মতো মেতে থেকেছে। নিজেকে এই ভঙ্গুর মোমেন্টে এইরকম একলা হয়ে যাওয়ার কয়েকটা এগজাম্পল দিতে পারলে ভাল হত। কাদের সঙ্গে এক লাইনে যাড়া হয়ে আছেন, সেটা মাঝে-মধ্যে খালিয়ে নিলে ছোটখাটো অসুবিধেগুলো আর ভাবায়-টাবায় না আর কী। কয়েকটা নাম স্লো মোশনে মাথার ভিতর লাবডুব খেলো। ব্রিজনাথ কেদারি (ম্যাজেরীশী), সত্যম্যান ন্যাশ (মিউজিকাল চেয়ার), টোমার টেভার (রেক ডান্স ও কৃষ্টি) এবং কৈকেয়ী লাখোটি (পুচিপুড়ি)। এঁরা কেউ জীবনে শান্তি পাননি। সংসার পাননি। স্বচ্ছলতা পাননি। সেগ...ডাউট আছে। পেয়েছেন শুধু শিল্পের চুড়ায় ওঠার আত্মাশেপাঁ। পেয়েছেন শুধু সত্যের আগুনে পোড়াবার মনপনির। সঞ্জয় সোম, ডেফিনিটলি, তাঁদেরই একজন। পৃথিবী তাঁকে, তাঁর নাগেনিন সাটিফাইইসকে এখনও জানেনি, সেটা পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া। তাঁর নয়। তাঁকে জাস্ট পা মুড়ে বসে এগিয়ে যেতে হবে, যেভাবে তিনি রোজ যান। শিল্প সবার জন্যে নয়। সেতার আরও কম লোকের জন্যে। আর সেই সেতার যখন সঞ্জয় সোমের হাতে কথা বলে, তখন একটি লোকের জন্যেও নয়। কোনও কথা হবে না।

এই উপুড় করা মাইন্ড বুস্টিং-এর পর রাত ন'টা নাগাদ নিজের বৈরাগীবাড়িকে হিঁচড়ে ইজিচেয়ার থেকে তুলে তিনতলার সাধনমন্দিরে ক্যারি করে নিয়ে গেলেন তিনি। কাল বোধহয় অমাবস্যা। তন্ত্র আর মন্ত্র, আজ দুটোরই সাধনার সেমিফাইনাল রাত। এ সময়ে পড়ে-পড়ে দুঃখে শান দেওয়াটা তাঁর মতো ট্যালেন্টকে জাস্ট মানায় না।

বেশ করলেন সেই জিনিস। সেতার। আজ টিন সুরে-সুরে নিজের দুঃখকেও ছাপিয়ে যাবেন। আজ প্রকৃতি নয়, নিজের দু'চোখে মিনারেল ওয়াটারের ধারা ডভিন করিয়ে দেবেন, এই কসম যেন পাজামার উপর হুঙ্গপরম শালটা বিছিয়ে সেতার তুলে নিলেন সঞ্জয় সোম।

বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলের টন নখটা দিয়ে একবার চিকারিটা মারলেন সঞ্জয় সোম। যা ভেবেছিলেন, জাস্ট তাই। শিল্পীর মন ব্যথা পাবে আর তার সেতার আগের মতোই সুরে বলবে, এ কি হতে পারে রে পাগলা? আবারও কেউটা নিজেকেই ছাড়লেন, এবং আনসারে মুহূর্ত বিষাদময় হাসি নিয়ে মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ হতেই পারে না।

মনযারাণ থাকলে এই সেতারের পাট্টিকুলার তিনটে নোট এক্কেবারে বসে যায়। কিছুতেই সুরে বলে না, দাঁড়াতে চায় না। মধ্যম, পঞ্চম আর নিখাদ। তিনটের সঙ্গেই মাইন্ডের স্ট্রেট যোগাযোগ। শিল্পীর মন নিজে এলে ওরা সবার আগে টের পায়। কুকুরের মতো। এরও ওষুধ সঞ্জয় সোমের কাছে আছে। বাজারে পাওয়া যায় না, তিনি নিজেই বানিয়েছেন। পাঁশু পুদিনার কচি পাতা, গোকুলদনার দুটো ছিপ, অন্ধ মুরগির চর্বি, মণিসোনা ছাপ জিরে গুঁড়ো ('দু' টি-স্পুন), মরণগঙ্গ বেড়ালের গুঁহ, গঙ্গার জল এবং প্রচুর ভালবাসা। এই হল মেন ইনগ্রেডিয়েন্ট। এই দিয়ে একটা স্পেশাল অয়েন্টমেন্ট, নাম খুব সিম্পিল, মাপানি তেল। মা, পা আর নি বিগড়ে গেলে লাগানোর জন্যে।

আজ তিনটে নোটই বলতে চাইছে না। সঞ্জয় সোম সেতার বগলে জাপটে এক হাতের চার আঙুল লাল রসে ডুবিয়ে তিনটে তারে আলাদা করে এন্তার মাপানি তেল লাগালেন। দেখতে-দেখতে দাঁড়িয়ে গেল। নোটগুলো আর কী।

এইবার তাঁর কথা হবে ডিরেক্ট গড-এর সঙ্গে। মাঝে কোনও শ্রোতা ফ্রোতা নেই। কোনও কালেই ছিল না অবশ্য। আজ আর নতুন কী। এইসব দুঃখের রাত বড় একটা আসে-টাসে না। এমন রাতে রেয়ার রাগ বাজিয়ে নিতে হয়। যালে ভাল। সঞ্জয় সোম অনেক দিনই অনোর তৈরি করা পার্থিব রাগগুলোর উর্ধ্বে চলে গেছেন। হোমমেড রাগ বাজান কেবল। আজ ১৯৮৯-এর জুলাই মাসের এক দুপুরে কম্পোজ করা গভীর মিডনাইটের রাগ ধরলেন। কান্না কানাড়া। নামই বলে দিচ্ছে, কী জিনিস হবে। হলও তাই। ঘরজে একটা জম্পেশ ব্যাং মরামাত্র লেভেলের দুলদুলিতে শেষ আস্থায় নেওয়া পায়রাটা নীরবে বডি হারাল। কিউনিতে এসব রাগের খুব এফেক্ট হয়। সঞ্জয় সোম চোখ বন্ধ করেই গুঁহ তেতলার ঘর থেকে সাধনার রগরগে রসে ডুবে যেতে থাকলেন, যেভাবে রাতের ঠান্ডাইমারা অতলান্তিকে লাট খেয়েছিল টাইটানিক। কোমল রেখাবের দু' সেন্সিমিটার দূর দিয়ে ঘুরে গিয়ে ডিরেক্ট মা-মরা মরামটা লাগাবেন, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল। সঞ্জয় সোম জানতেও পারলেন না, ওই চুড়ান্ত বিরক্তিকর বেলের জন্যেই একটা আস্ত ছুঁচো আজ বেঁচে গেল। মরামটা একবার লেগে গেলে তাকে কেউ বাঁচাতে পারত না।

কেটে যাওয়া ঘুড়ির মতো মেজাজ নিয়ে সেতারটা মেঝেতে নামিয়ে রাখলেন শিল্পী সঞ্জয় সোম। রাত পৌনে দশটা। এই সময়ে শেষ কবে সঞ্জয় সোমের দরজায় বেল বেজেছে, সেটা তিনি নিজেও মনে করে উঠতে পারলেন না। আজ যে-ই হোক, তার লাস্ট নাইট। কথাটা ভাবতে-ভাবতেই সাধনামন্দির ছেড়ে সিঁড়ি বিয়ে নামতে লাগলেন সঞ্জয় সোম। লোভলার ল্যান্ডিং-এ পা মেরেছেন কী মারেননি, আবার উপ্পাটে উত্তরোল। হঠাৎ কেন যেন একবার মনে হল সঞ্জয় সোমের, অনিমা ব্যাক করে এল না তো? হয়তো দুপুরের পর মনে হয়েছে সঙ্গেইত তার জন্যে শ্রেষ্ঠ পাত্র, হয়তো হিয়ালাইজ করেছে, শিল্পীকে ছেড়ে যাওয়া মানে জীবনের সুখ বোধগুলোর সঙ্গে বিট্রে করেনা। তা-ই যদি হয়, ভাবলেন সঞ্জয় সোম, এক মোমেন্টের মধ্যে রাগ বদলে আজ চরম গাঙনা বাজাবেন তিনি। কান্না কানাড়া পাল্টে কামালকাম্বো। আনন্দের মুডে বাজানোর জন্যে বানিয়েছিলেন, '৯২-এর মার্চে।

দরজা খুলে ডবল হাঁ। একটা উপো সেলসম্যান এই এত রাত্তিরে গাদাসাইজের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে নোভাইয়ো টাইপের মুখ নিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে। নির্ঘাৎ এসি মেশিন বেচতে এসেছে।

"ভাই না ভাই, আসুন এখন।"

বলে মুখের উপর দরজাটা বন্ধ করে দিতে যাবেন সঞ্জয় সোম, এঁড়ে

সেলসম্যানটা হাত দিয়ে দরজা ধরে বলল,

"প্লিজ ফিরিয়ে দেবেন না। আমি খুব চাই।"

এ তো আচ্ছা জ্বালা! সারাদিনে একটা মেশিন বিক্রি করতে না পেরে এই রাত দশটায় শিল্পের বারোটা বাজাচ্ছে।

"আপনি চাইলেই তো আর হল না, আমি চাই না। আসুন ভাই, এখন রেগুয়াজে বেসেছি।"

"একবার দেখে নিন, ভাল না লাগলে তখন বলবেন।"

এই তেএঁপেগুলির ট্রেনিং কোন গাধাকে দেওয়া হয়, জানতে একবার ইচ্ছে করে সঞ্জয় সোমের। বলছেন লাগবে না, তা-ও বলে চলেছে দেখে নিন।

"আপনি বুঝছেন না। এটা আমার রেগুয়াজের সময়। এখন হবে না।"

কথাটা শুনে অদ্ভুত একটা মাখিজা হাসি হেসে লোকটা বলল, "সেটা জানি বলেই তো আসা। বাঁপতালের ভাল ঢুকরা ছিল। লাগলে বলুন।"

এমন সমবাদার সেলসম্যান সঞ্জয় সোম জন্মে দেখ করেননি। তাঁর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে লোকটা হেসে বলল, "আমার নাম মুগাল শীল, ফারুকাবাদ ঘরানা। অনিমার কাছ থেকে আপনার ঠিকানাটা পেলাম। সঙ্গত করার বড় ইচ্ছে নিয়ে এসেছি দাদা। ফেরাবেন না।"

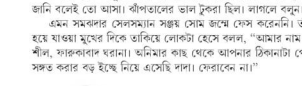

যখন রায়পাড়া এবং কলকাতার অন্যান্য অঞ্চলে এইসব কেচ্ছা কেলেঙ্কারি মোমেন্টাম গেইন করছে, তখন একটু দূরে এই গোটা নকশার প্রাণভোমরা তৈরি হচ্ছে। নভেলের কম্পাস আপাতত দূরে যাচ্ছে কলকাতা তথা ইন্ডিয়া থেকে টোটাল উত্তর পূর্বে, যেখানে পাহাড়ের ঢালে সূর্য উঠি-উঠি করছে। বেশি দূরে নয়, রাশিয়ায়। জায়গাটার নাম ভারখোভইয়ানা। ইউক্রেনের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে, কার্পেথিয়ান পর্বতের বঁড়ি ঘেঁষে। একটু গেলেই মলডোভার বর্ডার, তাই উভয়বাদীদের পক্ষে কাজ করার সবরকম সুবিধে এখানে অ্যাভেলেবল। ঝামেলা পাকিয়ে মলডোভার পাড়ি দিলে ইউক্রেনের প্রশাসন আঙুল চুষবে, আবার চাই কী কার্পেথিয়ান পর্বতের গায়ে চমৎকার গুহা-দুহা বেচে ফাইভ স্টার বন্দোবস্ত করা আছে। আপাতত ভোর চারটে, ঠান্ডা হাওয়ার চোটে সব শুকিয়ে কাঠবেড়ালি হয়ে যাওয়ার জোগাড়, তারই মধ্যে একটা দেদার বিস্তৃত খোলা এরিয়ায় এসে গুজুদুম-গুজুদুম করে নামল একটা হেলিকপ্টার।

ব্যাপার কী, সেটা বলার আগে ভারখোভইয়ানার এট্টু বিবরণ না দিলে ঠিক ফিলটা পাওয়া যাবে না। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, উভুক্ষু চিড়িয়াঁই ঠান্ডা। টেম্পারেচার এত মাইনাসে চলে যায় যে মাপা যায় না। নভেম্বরের গোড়ায় লোকজন সটকে পড়ে, নো স্নানীয় বাসিন্দা, নো টুরিস্ট। আবার সেই জুন-জুলৈ দুকতে সাহস পায়। এই যে এখন মে মাস, এখনও এদিক-ওদিক এট্টু-আধটু বরফ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ল্যাপ যাচ্ছে। গলবার কোনও ইচ্ছেই নেই। সামান্য ঘাস-টাস আছে, পাতা না দেখয়েই মতো। তাছাড়া কেমন একটা ন্যাড়া জায়গা এখানটা। দূরে ভারখোভইয়ানা শহরের বলমল আলো দেখা যাচ্ছে। আর পিছনে তাকালে দেখা যাচ্ছে কার্পেথিয়ান মাউন্টেনমালার ওপার থেকে সানি টুকি লাগাচ্ছে। যেখানটায় এখন নভেল ঘুরপাক খাচ্ছে, তার ঠিক ডাইনে, পাহাড়ের ঢাল শুরু হওয়ার গোড়ায় একটা পুরনো পরমাণু পরীক্ষণাগার। বিশাল বাবস্থাপনা, চারপাশ জালি দিয়ে ঘেরা, ভিতরে বড়-বড় সব ব্যাপার-স্যাপার আর ইন্ধ্রুমেন্ট, কিন্তু চেনোবিলে সোভিয়েত টপ কেস যাওয়ার পর থেকেই শাট ডাউন। কিন্তু সরকারিভাবে এর ভিতরে রীতিমত ডেরা গেড়ে বসেছে এই নভেলের বিদেশি ভিলেনের দল। এবার দেখে নেওয়া যাক, এই বীরেন ভট্ট টাইপ ভোরবেলায় একটা হুমদো হেলি এখানে কী করতে এবং কেনই বা করছে।

হেলিকপ্টারটা মাটিতে পরেগুণ্ঠি মাথানোমাত্র পরীক্ষাগারের ঠ্যাঙ গেট খুলে দু'জন দৌড়ে এল, হুজনেরই হাতে অকথ্য আগ্নেয়াস্ত্র। হেলিকপ্টারের দরজা খুলে যে-লোকটা নেমে এল, সে এখন ইউক্রেনের টেররিস্টুর, সেরগেই ইভ্যুলিচ। চাবকানো টানটান চেহারা, গায়ে খুলেট জ্যাকেট, পায়ে গামবুট, মুখে চুরুট, মাথায় উভুক্ষু সোনালি কাঁকড়া চুল। তার ঠিক পিছনেই নামল হিলহিলে সাপের মতো অ্যাট্রাক্টিভ বডিমঝী চাকুভিসের সেক্রেটারি কাম বডিগার্ড কাম প্রেমিকা (কাম এট্টু বেশিই হয়ে গেল) আনা মারিনা। দু'জনেই ভাল করে দু'পাশে তাকিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

পরীক্ষাগারের ভিতর যাকে ইন্ডিয়ান ভাষায় বলে চিরোরাতরি, সেই। শুধু কয়েকটা হলুদ হ্যালোজেন জ্বলছে। গোটা এরিয়ার চাম্বা-চাম্বা লোকজন বিভিন্ন মডেলের বন্দুক নিয়ে স্টোনমুখে দাঁড়িয়ে, দূরে একটা ফাঁকা এরিয়ায় আহামরি প্যাকিং মারা হচ্ছে। এখান থেকে, বোঝাই যাচ্ছে, বাকি ডায়লগ শ্রাশিয়ান ভাষায়। কিন্তু আমরা নিজেদের সুবিধের জন্যে সোটাকে হাঙ্কার উপর লাইভ করে বাংলা বানিয়ে নেব আর কী।

চাকুভিস একটা ইঁদুরে কাটা সোফায় বসি এলিয়ে লিল, হাতে গলগাদান নিয়ে চুমকি আনা মারিনা তার পেছে ঘেঁষে শরীল রাখল।

"কাজ কীরকম চলছে?"

ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন ডেভিকেটেড ইউক্রেনি যুবককে কোশ্চেনটা মারল চাকুভিস। সে নিজেও পাথরদেশ জাস্ট ফাঁক করে বলল, "আজ সকালের মধ্যে সমস্ত আর্মস লোড হয়ে যাবে।"

চাকুভিস খুশি হয় কি না, এটা ভেড়াগুঁথু বুঝতে পারে না। মানুষ তো দূরের। এখানে তার একটা হাফবায়ো দিয়ে নিলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। চাকুভিস এই এলাকারই ক্যারেক্টার, বাবা ছিলেন সিরিয়াস মেফলাকব। তখন সোভিয়েতের সোনালি ডেজ আর নাইসস, ভেড়া চরিয়েও চার পয়সা হতো। এই উপত্যকাতেই তাদের ছোট্ট কটেজ ছিল। বাবার সঙ্গে সারাদিন ভেড়াদের পিছনে ঘুরঘুর করতে-করতে সে এনজয় করত ইউক্রেনের সমস্ত এরিয়া। একটা বোন ছিল তার, মা অবিশ্যি আগেই গত হয়েছিলেন। ভেড়াদের লোম ছাঁটায় সে প্রতিবার বাবাকে হেল্পি মারত, বাবা খুশি হয়ে তাকে বশখিশ দিতেন, সেই টাকা জমিয়ে সে আর তার বোন শহর থেকে ললিপপ কিনে এনে খেতো। এই ছিল মোস্ত লাইফ। কিন্তু লাইফ অনেক বড় মামা।

খুলেই বলা যাক তাহলে। এমন যেখানে পরীক্ষাগারটা হয়েছে, তার ১০ কিমি দখিছে তাদের ছোট্ট কটেজ ছিল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকঘর মেফলাকই ছাড়া গোটা এলাকার বাসিন্দা। কিন্তু ভারখোভইয়ানার ভয়াবহ উইন্টারে সেই কয়েকঘরও শহরের দিকে শান্টিং মারত। থেকে যেতেন কেবল চাকুভিসের বাবা, ছোট্ট ছেলে আর মেয়েকে নিয়ে। তাঁদের ছিল টানাটানির সংসার, শীতেও কিছু রোজগার করে নিতে ছেলেমেয়েদের জন্যে পয়সা সেভিং করতে চাইতেন তিনি। সলে থেকে যেতেন। সেইসময় সোভিয়েত সরকার পরমাণু পরীক্ষণাগার বানাবে বলে জমি অধিগ্রহণ চালাচ্ছে ল্যাম্পট রেটে। তারই মধ্যে চাকুভিসদের কয়েকঘরও পড়ে গেল। বাকিঘরের লোকজন তো তখন বাড়িতে নেই। তাদের ঘরবাড়ি ইঙ্গিলি পুড়িয়ে দেওয়া হল, ঝামেলা হল চাকুভিসদের নিয়ে। তার বাবা ছিলেন সুপার জেলি মানুষ, প্রাণেরও আছিল ইন্ডেন্স, এমনটাই বিলিভ দিতেন তিনি। সেই বিলিভের মাসুলও তাঁকে দিতে হল।

প্রথম দিন দরদাম চলল, সিনিয়র চাকুভিস রাজি হলেন না। পরের দিন ভয় দেখানো হল, তাতেও বাড়ি ছাড়তে নারাজ হয়ে থাকলেন। থার্ড দিন রাত্তিরেলো জাস্ট আগুন লাগিয়ে দিল। জুনিয়র চাকুভিসের চোখের সামনে তার বাবা, বোন, বাড়ি আর ভেড়ারা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সে বাইরে থেকে কাঠ আনতে গিয়েছিল বলে নিজেও বেঁচে গেল, কিন্তু ফিরে যখন দেখল কার্পেথিয়ানের গায়ে তার বাড়ি আগুনের ছায়া লকলক করছে, বাবা আর বোন, যাদের সঙ্গে আর ঘণ্টা আগে বসে রাতের খাবার খেয়েছে, তারা জাস্ট ছাই হয়ে গিয়েছে, তখনই সে শপথ নিল, সোভিয়েত সরকারের বাটু নিজে দিয়ে তবে দম নেবে।

সেই থেকে সে নিজেকে তৈরি করেছে। নিজের দল তৈরি করেছে। আর নিজের মতো তৈরি করেছে তেলের টপ লোভা কারণ সে বুঝে গিয়েছে, তেল থাকলে সরকারও সমঝে চলে এ দেশে। তাছাড়া মাস্তিমাম তেলের দখল থাকলে বা বাইরের পাইপলাইন ট্যাগ করতে পারলে যে-কোনও শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সরকারের হুলিয়া বিগড়ে দেওয়টা জাস্ট পাঁচ সেকেন্ডের মামলা। এই মাইন্ডে নিয়েই সে চেচেন জঙ্গিদের সঙ্গেও ভিড়েছিল, কিন্তু শমাংক করে সোভিয়েত সরকারটাই পড়ে গেল। কুছ পরোয়া নেহি, যারা কেন্দ্রে আছে, তারাই চাকুভিসের চরম টার্গেট। এইভাবেই চাকুভিস এগোচ্ছিল। কিন্তু চেচেনদের সঙ্গেও তার হেবি ঝাম পাকল। আলটিমেটলি নিজের দল, এবং ভারখোভইয়ানা থেকে গোটা ওয়ার্ল্ডের তেলের লাইনে গিয়ে দাঁড়ানো।

এখন ইউক্রেন সরকার তার মাথার প্রাইস ঘোষণা করেছে, সে বড় কমও নয়। ভেবে ভাল লাগে চাকুভিসের। ভেড়া নিয়ে মাঠে ঘুরে বেড়ানো একটা ছোট্ট ছেলে এখন দু'পাশে আর্মড বডিগার্ড নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে যাচ্ছে। সিনেমার স্ক্রিপ্ট আর কাকে বলে!

আপাতত তার ইচ্ছিয়া অভিযানের প্রস্তুতি জোর কদমে চলছে, সেই

নিয়েই হালকার উপর লাইট করে কিছু কনভারসেশন আমরা রিসেনিং করে নেব।

"জাহাজ বেরিয়ে গিয়েছে?"

"হ্যাঁ বস, দু'দিন আগেই। শনিবার ঠিক সময়ে গিয়ে ডক করবে, চিন্তা নেই।"

"আর বাকিটা?"

"কথামতোই এগোচ্ছে। আমরা শনিবার গভীর রাতে রওনা দিলে ওদের সন্ধেবেলায় গিয়ে ল্যান্ড করব। ডপারে যুব বেশি হলে ঘণ্টা পাঁচেক লাগবে।"

"হুম। ওদিকে নেটওয়ার্ক? ইন্টেলিজেন্স?"

"ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না বস। ওটা ইঙ্গিলি হ্যান্ডল করে নিয়েছি।"

"কীরকম?"

"ওদের জাস্ট আগের দিন, মানে শুক্রবারের কথা বলে লোকেশনটা জানিয়ে দিয়েছি। ওরা স্পেশ্যালিটার থেকে শনিবার ভোর পর্যন্ত ফুল ফোর্সে ওখানে বডি ফেলে দেবে। তারপর শনিবার দুপুরের মধ্যে টিম নিয়ে ফিরে যাবে। শনিবার রাতে ওখানে কিছু হতে পারে, এটা ওরা আর কল্পনাও করতে পারবে না।"

"ক্রেডার পিটার, ভেরি ক্রেডার। ফোন করেছিলে?"

"হ্যাঁ, স্যাটেলাইট ট্যাপ করে ওখানকার পনেরোজনকে ফোন করা হয়েছে, চারটে এলাকা স্পেসিফাই করে। বেশিরভাগই বাঙালি, ভয়ের কিছু নেই।"

"আমাদের নম্বর ট্রেস করতে পারবে না তো?"

"প্রশ্নই নেই। এখান থেকে কল করে জাপান দিয়ে ডাইভার্ট করিয়ে নিয়েছি। মোট পনেরোটা ডিভিটা। কারও বাবার সাধ্য নেই ট্রেস করে।"

"ভেরি গুড। হোটেলটা বুক করা আছে? আর আমার রুম?"

"হ্যাঁ, পিটার রুকের নামে।"

"সে তো ইংরেজ।"

"ওই হল বস। বাঙালিরা ছোটবেলায় রুশ উপকথা পড়েছে আর ইংরেজদের শাসনে থেকেছে। এখন এই দুটোই গুলিয়ে গিয়েছে ওদের। আপনাকে ইংরেজ বলে চালাতে অসুবিধে হবে না।"

"ওকে। ড্রিলারগুলোর কী অবস্থা?"

"টপ ফর্মে আছে, আমাদের সঙ্গে ডপারেই যাবে বস।"

"ওখানকার এলাকার লোকজন?"

"অস্ত্র দেখেও যদি ভয় না পায়, দইয়ে দিতে আমাদের দেরি হবে না।"

"ট্র্যাকার যাচ্ছে?"

"অফ কোর্স বস, তেল ট্র্যাক করতে পারলে গোটা পাইপলাইনটা টানতে আমাদের দু'রাত লাগবে। তার মধ্যে গভর্নমেন্ট খবর না পেলেই হল, ব্যাস। তারপর যা হবার তো রাশিয়ান সরকারের সঙ্গে হবে। মামলার ফয়সালা হতে-হতে আমরা বিলিয়োনেয়ার। যা-যা অস্ত্র আপনার চাই, সব কেনা যাবে বস।"

কথাটা শুনে সোফা থেকে বডি উত্থান মেরে আলোকিত গ্রাউন্ডে গিয়ে দাঁড়াল চাকুভিচ, পিছন-পিছন আনা মারিনা। সকলেই জানে, সে চাকুভিচকে ভালবাসে। রাত হলে বডি-ফডি দেয়। কিন্তু চাকুভিচ তাকে পাত্তা ভালবাসে কিনা, এ জিনিস কেউ জানে না। অনেকেই বলে, ছোটবেলায় তার বাবা আর বোনের সঙ্গে তার ইমোশনারাশিশ করবে রান ফট। কিন্তু এ-ও ঠিক, কেউ যদি আনা মারিনার দিকে আঁখ তুলেও তাকায়, তার বাবার নাম রাশিয়ান খনেন হয়ে যেতে তিন সেকেন্ডও লাগে না।

এরপর একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকে গেল চাকুভিচ। পরশু লম্বা অপারেশন, তার আগে মাইন্ডটাকে একটু রেসিংট খাওয়ানো দরকার। সঙ্গে আনা মারিনাও ঢুকল। সাউন্ড সিস্টেমে মাইকোভস্কি চলছে, চাকুভিচের প্রিয় পিস।

আনা মারিনা চাকুভিচের ডিভানটেন ডিগ্রোস্টে মুড বুঝে আস্তে করে পাশে সিটিং নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল।

"ক্লান্ত?"

"হয়তো। ক্লান্তি কাকে বলে, এখন আর বুঝি না।"

"এসবের কি খুব দরকার ছিল চাকু?"

"কথাটা তো সোভিয়েত সোনাদের জিগোস করতে হতো। এসবের কি খুব দরকার ছিল?"

"তুমি তো অন্যরকম একটা জীবন কাটাতে পারতে, তাই না?"

"এর চাইতেও অন্যরকম?"

"তুমি ভালই জানো আমি কী বলতে চাইছি। জানো না?"

"হয়তো জানি। কিন্তু শান্তি নেই। যদিন না এই দেশটাকে ভিতর থেকে ছারখার করে দিতে পারছি, আমার শান্তি নেই।"

"ধরো যদি গ্যাজেসে তেল পাও, কী করবে?"

"তুমি তো প্ল্যানটা জানো আনা। ডিল করব। তারপর ঠকাব। তারপর গোটা রাশিয়াকে উড়িয়ে দেব একদিন।"

"আপেল খাবে?"

এই মোমেন্টে এমন আনাভাবড়ি কোন্সেন করার সাহস একমাত্র আনা মারিনাই রাখে, তাই করেছে আর কী।

"কোন আপেল?"

"আমার দুটো নয়। ইউক্রেনের ক্রেম সত্যিকারের আপেল।"

অল্প হেসে হাত বাড়াল শুয়ে থাকা চাকুভিচ, তার হাত হাতের মুঠোয় ভরে আর-এক হাত দিয়ে তার মুখে আপেল ঠেসে ধরল গনগনে আনা মারিনা। কার্পেথিয়ানের মাথায় তখন সূর্য লাভা ঢালছে আস্তে-আস্তে।

"কেস কিন্তু কেলেঙ্কারি বোসদা।"

বিলিতি বোসের চৌষুপিতে চুকে মোড়ায় বসে কথাটা যখন ডেলিভারি দিচ্ছে টফি দে, তার অনেক আগেই বিলিতি বোস টের পেয়েছেন, ব্যাপার কেলেঙ্কারি। বেঁচে যে গিয়েবেন না এ নিয়ে কোনও ডাউট নেই, বডি পাওয়া যাবে কিনা, সেইটাই থিংকিং করছেন আর কী। এমন সময়ে টফি দে-র এই উক্তি। তবে ওর মনে ব্রেভারিটা টুকিয়ে দিতে হবে।

"কিন্তু কেলেঙ্কারি নয়। একরম কত কেস আমরা হ্যান্ডল করি জানিস? একবার তো কিনিয়ার জঙ্গলে পিগমিদের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে সে একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড। রাশিয়ানদের তবু মায়া-দয়া আছে।"

বলতে-বলতে নিজের রাত কাটানোর উপকরণ বার করলেন বিলিতি বোস। ভরুণা পিগুর রাশিয়ান মঁ যাবে বলে। রাশিয়ানদের হাতেই যখন মরতে হবে, ওদের ক্রেডারটা টপ টু বটাম মেরে দেওয়াই ভাল। একটা চুমুক নিয়ে বসলেন বিলিতি।

"এখানে প্রশ্ন একটাই রে টফি, নাহলে মিশন জিতে ফেরাটা কোনও বিরাট কাজ নয়।"

"কাজ নয়?"

"কাজ নয়।"

"বলছ?"

"বলছি।"

"তাহলে কোন সেই ব্যাপার যেটা নিয়ে তোমার ডাউট?"

"হুলিয়া তো শুনলি?"

"মানে?"

"উফ, এজেন্টের শাগরেদ হয়েছিস, একটা ল্যাঙ্গুয়েজ প্রপারলি বুঝিস না। তোকে তো বললাম ফেরার পথে, কী সব ডেঞ্জারাস গুয়েপন নিয়ে ওরা ঢুকছে।"

"সেইজন্যেই তো কেলেঙ্কারি কথাটা বললাম।"

"স্বাভাবিক, তোর সেরকম মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু কথা হচ্ছে, আমাদের এরকম ভাবলে চলবে না যে আমাদের হাতে গুয়েপন নেই।"

"তাহঃ কী গুয়েপন আছে?"

"প্রাইমারিলি বুদ্ধি আছে।"

"কিন্তু কেবল বুদ্ধি দিয়ে অতগুলো অস্ত্রের সামনে লড়া যাবে?"

"গুড কোশ্চেন রে টফি, গুড কোশ্চেন। কথা হচ্ছে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে যাবে না। আজ রাত বা কাল সকালের মধ্যে আমাদের এমন অস্ত্র জোগাড় করে ফেলতেই হবে, যার কোনও লাইসেন্স নেই, অথচ যার সামনে রুশেট লঞ্জাঙ্ক কেঁপিয়ে পড়বে।"

"কী বলছ, আমি কিছু বুঝতেই পারছি না।"

"পারবি, কিন্তু তার আগে রাশিয়ানদের মাইন্ডটা তোকে বুঝতে হবে। আর তার জন্যে জানা চাই রাশিয়ার ইতিহাস। বুঝলি?"

বলে আর-এক বড় ঢোঁক ভরুণা মেরে বিলিতি বোস চরম মুখ খুললেন, "রাশিয়ানদের ইতিহাস খুব ইন্টারেস্টিং, জানিস তো? রুশ নামটা এসেছে কোত্তোকে জানা আছে তো? রসভেল্ড। উনি রাশিয়ায় একটা বিপ্লব

আনবেন-আনবেন করছেন, এই সময়ে বরফ পড়তে শুরু করল। সে একেবারে মারকাটারি বরফ। বিপ্লবের আগেই শীতকাল চলে এল, কসফেন্ট মারা গেলেন। এইতে হল কী, অনেকে ঘেঁটে গেল। বিপ্লব আলটিমেটলি হবে কি হবে না, নাকি কুরোসাওয়া, মানে জাপানি গ্যাং লিডার, তার হাতেই দেশটাকে গঁপে দিতে হবে, এইসব ভাবনা-চিন্তা চলতে লাগল। তখন রাশিয়ার বিখ্যাত লেখকদের ধরে কুকুরটা ধরা হচ্ছে। সরকার-বিরোধী কথা লিখলেই মৃত্যু। প্রথমেই কেস যেলেন রুশো। নাম শুনেই বুঝতে পারছিস, রাশিয়ার একেবারে মহামনি। তাঁকে কেস দেওয়ার পরপরই সাজা গেলেন আরও অনেক লেখক। তখন বিপ্লবের হাল ধরতে এগিয়ে এলেন চাসিল। চারদিক থেকে চিল ফ্যাক্টর তাঁকে বাধ্য করতে পারে না বলেই রাশিয়ানরা এমন নাম দিয়েছিল। গুলিকে লেনিন-ফেনিন তখন বিশ্বযুদ্ধের আয়োজন করছে। অবস্থাটা ভেবে বাদ্য একবার। তার মধ্যে চাসিল বিখ্যাত রুশ পার্টি মুর্লা। রুশ ফর্ম করলেন এবং বিপ্লব আনলেন। তবে দেশটা আস্তে-আস্তে বুজোয়িদের হাতে চলে গেল। পিকাসো, কোগানিকাস, সাল্তে, তারপর ধর তোর স্পিলবার্গ, গুটেনবার্গ, এরা সব রাশিয়া ছেড়ে চলে গেল। এরপরেই রাশিয়া গণতন্ত্রের আওতায় পড়ে ফুল ঘেঁটে গেল। বুলেট থেকে ব্যালট হয়ে গেলে যা হয় আর কী। এখনও সেই ঘাঁটা স্টেজই চলছে, ওরা আবার ব্যালট থেকে বুলেটে ফেরার চেষ্টা করছে। তার মধ্যে ভারতীয় তেল যদি হাতাতে পারে, আহ্লাদ লাগল বলে!"

সম্পূর্ণ ইতিহাস স্মৃতি থেকে উগরে দিয়ে বিলিতি বোস বাকি ভবকাঁকুনি চকাং চুমুকে মেরে দিলেন। সামনে বসে হাঁ হয়ে শুনতে থাকা টফি দে নিজের এঁতোইসিক ক্ষয়ষ্টে টেরও পেল না। কাজের সে টোটাল মুগ্ধ। টফি বলল, "বোসদা, তুমি এত নলেজ গ্যাদার করলে কোত্থেকে?"

"অভিজ্ঞতা দে, অভিজ্ঞতা। তারপর তোর বর মাসিভ একটা পড়াশোনা তো আছেই।"

"উফ্, হিলিং ইতিহাস।"

"আরও ছিল আছে। এক কাজ কর না, আজ রাতের কাজ তো রাতেই শেষ হয়ে যাবে, কাল সকাল-সকাল টিটোর বাবার দোকানে একবার চুঁ মার। জাস্ট দ্যাখ রাশিয়ার ইতিহাস নিয়ে কোনও বই আছে কিনা। খাবার কিনে টক করে পড়ে নে, কাজে দেবে।"

"বেশ, বলছ যখন, তা-ই করব। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে ক্লিয়ার। ওরা এখন মুখ ঘেঁটে আছে। তাই তো?"

"একজ্যাক্টলি। আসল পয়েন্টটা ধরে নিয়েছিস। পুরো ঘেঁটে ধ যাকে বলে। এ সময়ে ওদের পকেটে অস্ত্র যাই থাক না কেন, মনে বল নেই। ওদের যদি আরও ঘেঁটে দেওয়া যায়, তাহলেই কেল্লা ফতে। জাস্ট কনফিউজ করে দিতে হবে।"

"তুমি শিওর?"

"ড্যাম শিওর। কনফিউশন হল বিপ্লবের সবচাইতে বড় শত্রু। পৃথিবীতে কত-কত বিপ্লব বা অ্যাটাক ফেল কনফিউশনের জন্যে ভেস্তে গিয়েছে জানিস?"

পাছে আবার বিলিতি বোসের মুখ থেকে কিছু জানতে হয়, টফি দে এক দমে বলল, "জানি।" ছোট্ট ঘটনার মধ্যে একটা দমদার পায়চারি স্টার্ট মারলেন বিলিতি বোস। আসার সময়ে টফি দে-র মাকে বলেই এসেছেন, ছেলে এখন নিন্দারেক তাঁর সঙ্গে ফলো টানবে, চিন্তার কিছু নেই। এই সময়টা হচ্ছে বিলিতি বোসের জুশিয়াল টাইম। যে-কোনও অভিযানে ডাইহ মারার আগে নিজের ভাবনাগুলোকে ইস্ত্রি লাগিয়ে পাট-পাট করে ব্রেনের তাকে সাজিয়ে রাখা। এরপর যখন যেটা দরকার, জাস্ট নামিয়ে ইউজ করবেন।

একটা জিঙ্গুজ্বাড়ু আইডিয়া তাঁর মাথায় কোকিলের বাচ্চার মতো ঠুকরে দিয়ে মিলিয়ে গেল। তিনি কি ঠিক ভাবছেন? এটা কি কমব্যাট করার একটা রাস্তা হতে পারে? অস্ত্র হতে পারে? নাহ্, ভাবনাটা নেহাত জোলো, এমন বলাই যাবে না। বরং জোরালো। রাশিয়ানরা গুলি থেকে গুলতি, সবকিছু এস্কেলেট করে শালিমার শিশুইয়ার্ডে পিছন গলাতে পারে, কিন্তু যে-অস্ত্রের কথা বিলিতি বোসের মাথায় চিড়িক মেরেছে, তার কথা এমনকী কিউবানরাও কল্পনা করে উঠতে পারত না। এখন ডিসিকলিট হচ্ছে এক রাতের মধ্যে এই ধরনের নতুন ও রেয়ার অস্ত্রোপ্তে করা। কিন্তু ডিসিকলিট বলেই ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জিং। আর চ্যালেঞ্জিং না হলে সেটাকে কাজ বলে মনে করেন না এজেন্ট বোস। বিলিতি বোস।

ঝটিতি দেরাজ খুলে বহুরূপনেতা আগের একটা হলদেটে মেরে যাওয়া কাগজ আর ইঁদুরে পিছন চিবনো পেনসিল টফি দে-র হাতে তুলে দিলেন বিলিতি।

"ঝটপট লেখ।"

"কী লিখব, যা-যা বলল?"

"উঁহু, যা-যা এখন বলব। একের পর এক অয়েপন বলে যাব, লিস্ট কর। তারপর সেগুলো কালেন্ট করতে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

"এই এত রাতে?"

"না তো কি কাল দুপুরবেলা অটোর পিছনে মাইক ফিট করে ঘোষণা করতে-করতে? মনে রাখবি তুই সিক্রেট এজেন্টের সঙ্গে কাজ করছিস, কোনও পলিটিক্যাল লিডারের সঙ্গে নয়।"

এরপর সত্যিই আর কোনও কথা চলে না। ইন ফ্যাক্ট, আমরাও আর কোনও কথা শুনতে পাব না, কারণ নভেলের এই চ্যাপ্টারের বাকি অংশটা মিউট মার্ক থাকবে। কিন্তু দেখতে পাব, টফ উত্তেজনায় পায়চারি করতে করতে বিলিতি বোস ঠোঁটের কোনায় আঙুল ঘষছেন, আর একের পর এক নাম বলে যাচ্ছেন টফি দে-কে। টফি দে একের পর এক নাম লিখে যাচ্ছে, ঠিক যেরকম স্ল্যানচেটে আত্মার ঠুসকি যাওয়া মিডিয়ামরা লেখে আর কী।

লিস্টি বানানো যখন শেষ হল, তখন রাত দেড়টা মতো বাজে। রায়পাড়া সুনসান, গোটা কলকাতার কোথাও জেনারেল পাবলিক ভাবতেই পারছে না যে তাদের প্যারেমাউন নগরী এত বড় ইন্টারন্যাশনাল প্লটের সামনে পড়ে আছে আর একটা চৌমুপিতে সেটাকে ঠেকানোর চেষ্টা চলছে। আপাতত ঝটিতি কাগজটা হাতে নিয়ে টকাটক মিলিয়ে নিলেন বিলিতি বোস। এখন দেখতে হবে, আইটেমগুলো আদৌ জোগাড় করা যাবে কিনা। ইন ফ্যাক্ট, জোগাড় না হলে কী হতে পারে, তার কোনও আইডিয়া বিলিতি বোসের ব্রেনে এখনও নেই।

এবার বেরনোর পালা। নিয়ম অনুযায়ী বিলিতি বোস তাঁর ব্যাসখানেক চাকরটা জড়িয়ে নিলেন গায়ে, টিফিকে বাধ্য হয়ে একটা ঢোলা সোয়েটার পরতে হল, এই মে মাসের ডিপ নাইটে। তারপর তাঁরা রায়পাড়ার সদাচায় কনম রাখলেন। আড়ে-আড়ে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। কোথাও কোনও সাক্ষী নেই। কেবল সঞ্জয় সোমের তেতলার পাঁচিলে বসে থাকা একটা বেড়াল আলাপ শুনে মরতে বসেছিল, পাইপ বেয়ে নেমে এসেছে। কিন্তু এই হল্কা গরমে টফি দে-র গায়ে গাঁয়া সোয়েটার দেখে টেম্পোরারি ডিরমি খেল সে।

অনেকদিন পর মনের মতো একটা চ্যালেঞ্জ পেয়ে বিগিনানা ধিকতানা মোডে চলে গেছেন অনিমেষ ধর। তিনি একরকম ঘরেই নিয়েছিলেন, কাজেই আর যে এক-দু'বছর বাকি আছে, তাতে তেমন কড় ব্যাপার আর হ্যান্ডে আসবে না, নিরিমিষ হাবলু একটা এন্ডিং দিয়েই কেরিয়ারের ফাইলে লাল সিতে পড়বে। কিন্তু না। নিয়তি যেখানে কলকাটি নাড়ে, সেখানে পিন্টুর বাবাও কিছু করতে পারে না। কোনও কথা হবে না। আজ আবার বুকের মেডেলগুলো অনিমেষ ধরের নিভৃত বুস্তে মুখোঁচা দিচ্ছে সকাল থেকে।

ভোর থাকতেই উঠে পড়ে রেডি হয়েছেন তিনি, শার্প ন'টায় টপ লেভেলের সিক্রেট বৈঠক ডেকেছেন নিজের অফিসে, হাতে যাকে বলে সময় একদম নেই। আজ বেস্পতিবার যখন, তখন বড় রকম কোনও দুর্ঘটনা না হলে আগামীকালই শুরুবার হবে। আর সেদিনের তারিখেই শুমকিটা এসেছে। তবে হ্যাঁ, এখানে বলে রাখা বেটার, যত তুড়ুড়ি দুমকিই হোক না কেন, অনিমেষ ধর এখন একটু আয়েশে কাজ করতে পেছন করেন। তাতে লাভ হয় আখেরে। ওই তাড়াহুড়োর মেডেল বাগানো টাইপ কাজ তাঁর একেবারে লাইকি-এর মতো নেই।

ন'টা বাজতে তিনের মধ্যে কেবিনে ঢুকে সব ঠিকঠাক করে নিলেন অনিমেষ। বহু বছর কাজ নেই বলে টেবিলের উপর যত হাবিজাবি জিনিস জড়ো হয়েছে। ছোটদের মাসিক পত্রিকা 'মনপোয়ারা', অলিবর্নি বসুর গাওয়া লোকগানোর সিডি 'ভেলা কেন ভেসে যায়', এবং বিখ্যাত জাপানি পর্নস্টার টানাকি ইজিরে-র একগাদা ন্যাংটো ছবি। তিন মিনিটের তৎপরতায় এসব সাফ করে অনিমেষ ধর তাঁর পল্য ল্যাপটপ খুলে গম্ভীর হয়ে বসলেন।

সময়ে সব হাজির। তাঁর ডিরেক্ট পরের পোস্ট থেকে এক্কেবারে পিন্টন পর্যন্ত। পিন্টন অবশ্য চা দিয়ে চলে গেল, বাবিরা রেডি।

"দেখুন তো এটা কী ভাষা বুঝতে পারেন কি না?"

একজন ভাষা এক্সপার্টকে হুমকি চিঠিটা এগিয়ে দিতেই তিনি এক ঝলক দেখে বললেন, "এ তো রাশিয়ান সার। তবে তলাটা ঠিক..."

"ওটা ইংরিজি। যা-ই হোক। তার মানে রাশিয়ানরা অ্যাটাক করছে।"

"কী বলছেন স্যার? রাশিয়ানরা আমাদের অ্যাটাক?"

ঝুনেন বলে রাখা বেটার, একইসঙ্গে অনেকে অনিমেষ হরের কথায় রেসপন্ড করছেন, সকলেই যেহেতু ইন্টেলিজেন্ট, আলাদা করে নাম না জানলেও চলবে। সব ইন্টেলিজেন্ট লোককে একরকম দেখতে।

"কী বলছেন স্যার? রাশিয়ানরা আমাদের অ্যাটাক?"

"স্পষ্টই তো লিখেছে, প্রাণের মায়া থাকলে সেন্সি ওখানে না যেতো। তার মানে ওরা সেন্সি ওখানে নামতে এবং অপারেট করবে। ক্লিয়ার।"

"কিন্তু আগেই যে নামেনি আপনি কী করে বুঝলেন স্যার? রাশিয়ানরা খুব ধূর্ত।"

"ঠিকই, কিন্তু আমরা হারামি। তাই আমরা যেটা ভাবব, সেটাই ঠিক। তাছাড়া এক্ষুনি একবার উলুবেড়িয়ার কারেসপন্ডেন্টকে ফোন করো, খোঁজ নাও ওখানে কোনও ইনসিডেন্টেশন হয়েছে কি না।"

"সকালেই সব জায়গা থেকে খোঁজ নিয়েছি স্যার, আপনি বলার পরেই। কোথাও কোনও কেস নেই।"

"তাহলে? বলেছিলাম তো? উলুবেড়িয়া ক্লিয়ার মানে ওরা এখনও নামেনি। ডিরেক্ট শালিমাটেই নামবে।"

"একটা কথা বলব স্যার?"

"কী?"

"আপনার নলেজ দেখে এমনিতেই খুব ভাল লাগে, কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক বুঝলাম না।"

"কী ব্যাপার? তাড়াতাড়ি বলো, এরপর স্ল্যানিং আছে।"

"স্যার, এত জায়গা থাকতে আপনি উলুবেড়িয়ার কথা জিগেস করলেন কেন?"

"কারণ ওই একটা এরিয়ার নামের সঙ্গেই রাশিয়ার সাইবেরিয়ার নামের মিল আছে। সেই কারণেই রাশিয়ান লোকজনের, বিশেষ করে জঙ্গিদের, উলুবেড়িয়ার উপর একটা উইকনেস আছে। মানে ওখানে এসে নামলে একটা সিল অ্যাট হোম হয় আর কী। এর আগেও রাশিয়ান ইনভেশন উলুবেড়িয়া দিয়েই হয়েছে। তাই জানতে চাইলাম।"

"অনবল্য সার। অসামান্য।"

"ঠিকাছে ঠিকাছে। এখন বলো, কীরকম স্টেটাস?"

"সব রেডি স্যার, আপনি জাস্ট বললেই অ্যাকশনে নেমে পড়ব। কাল বিকেলে পোজিশন নিয়ে নিই?"

"এই জন্যেই আমাদের কিছু হল না। বিদেশের যে-কোনও ইন্টেলিজেন্সকে কেউ যদি হুমকি দেয়, সে সঙ্গে-সঙ্গে পিছন তুলে পৌঁছে যায় না। একটু খেলিয়ে তারপর যায়। এক দু'দিন পরে যায়। শত্রুদের বোঝানো দরকার, আমাদেরও কাজ আছে, আমরা খালি হাতে তাদের জন্যে থালা সাজিয়ে বসে নেই। অত পাত্তা দিলে যে-কোনও দেশের জঙ্গিরাই পেয়ে বসে।"

"তাহলে স্যার কী করব?"

"রিল্যাক্স। একটা দিন সময় নাও। ওরাও সেটল করুক। আমাদের জন্যে ওয়েট করুক। আমরা ক্যালানে না সেটা বুঝুক। তারপর এগোও।"

"ততক্ষণে যদি অ্যাটাক করে দেয় স্যার?"

"এত আদেখলেপনা দেখলে আমার গা পিত্তি জ্বলে যায়। করলে করবে, তার জন্যে পুলিশ আছে। আমরা ইন্টেলিজেন্স। অন্যান্যে, অন্য রেলার কাজ করব। রাশিয়া থেকে এসে কেউ একদিনে ফিরে যাবে না, আশেপাশেই থাকবে।"

"তাহলে সার শনিবার রাতে অ্যাকশন?"

"ইয়েস। অ্যামুনেশন্স রেডি আছে?"

"একদম সার। ডবল স্কোয়াড বলব? রিসের্ভেল ভাল কুকুর রিক্রুট হয়েছে।"

"দরকার নেই। আন্ডারডগেই হবে।"

"ওকে স্যার।"

"মনে রাখবে, রাত ন'টার মধ্যে গোটা এলাকা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা চাই। আর আমার ইন্ডাকশন না পেলে কেউ ফায়ার ওপেন করবে না। ক্লিয়ার?"

"ক্লিয়ার স্যার।"

"হাউ মে গো নাও।"

কথাটা শোনামাত্র সকলে হেয়ে বেরিয়ে গেল। আলিশান কেবিনে একা বসে টেবিলের উপর রাখা পেপারওয়েট হাতে নিয়ে আনমনে ঘোরাতে লাগলেন অনিমেষ হর। পেপারওয়েটটার তলার দিকটা ভেজা-ভেজা, এটা দিয়েই অ্যান্ডিদ টানাকি ইন্ডিরেন্ট ফটোগ্রেফো ছাপা দেওয়া ছিল। মনটা কেমন মিয়াউ ডাউমিনের মতো হয়ে গেল অনিমেষ হরের। ডিউটি শানাতে গিয়ে জীবনটাকে ফুললি এনজয় করা হল না। এত হাই পোস্টের লোক, কিন্তু বউটের বাইরে কোনও অ্যাফেয়ার নেই। সেক্স তো দূরের কথা।

সেই কথাটাই ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়ালেন অনিমেষ হর। তাঁরই উদ্যোগে গোটা কেবিনের দেওয়াল জুড়ে সারা পৃথিবীর ইন্টেলিজেন্ট লোকজনের ছবি টাঙানো। এতে একটা রেজুলার প্রেরণার ব্যাপার থাকে। পরপর বেষে যেতে থাকলেন অনিমেষ। মহাত্মা গাঁধী, রোনাল্ড রেগন, ইলা অরুণ, রবি শাস্ত্রী, আইনস্টাইন, জন ন্যাশ, জ্যাকি শরু, রামকৃষ্ণদেব, কৃষ্ণ, দেব, রাম, প্রীতি জিন্টা এবং আরও অনেকে। ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে ভাবলেন, এই কেসটার পর হয়তো তাঁর নিজের ঘোরগুণ এই একই লাইনে শোভা পাবে। নিজেকে নিয়ে গর্ব করার টাইম নেহাত পান না, নইলে সেটা কিছু কম হতো না অনিমেষ হরের।

আপাতত এক কাপ গরম চা দরকার। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সাত তলার খুলবারান্দায় দাঁড়ালেন ইন্টেলিজেন্ট অনিমেষ হর। বড্ড গুমোট। মে মাসের এই সময়টায় রাশিয়ানগুলো কেন যে এমন স্ল্যান ঝাসল, কে জানে। অবশ্য ওই কঙ্কাল কাঁপানো উইন্টার থেকে এখানে এসে ওদের ভালই লাগবে। চায়ে চুমকি চুমুক দিতে-দিতে যেয়াল করলেন অনিমেষ, উত্তর-পূর্ব দিকের আকাশে বেশ ভালরকম মেঘ দল পাকাচ্ছে। কোনও ফোরকাস্ট ছিল কি? বাঙালির ফোরকাস্ট আর ফোরস্লে জীবনে সাকসেসফুল হয়নি। কিন্তু মিশনের সময় যদি বৃষ্টি হয়, কাজ কেঁচিয়ে যাওয়ার একটা ন্যাচেরাল চান্স থাকে। কী মনে হতে টেবিল থেকে ওয়ার্ল্ড ম্যাপটা তুলে নিয়ে এলেন বারান্দায়, এক চান্সে খুলে দাঁড়ালেন। মানে, ম্যাপ। যেয়ান করে দেখলেন, মেঘগুলো যেদিকে বুঝগুড়ি মারছে, ঠিক ওই দিকটাতে এগোলেই উলুবেড়িয়া। আর সেখান থেকে নাক বরাবর কয়েক হাজার কিমি এগোলেই বরফ মাড়ানো সাইবেরিয়া। শিরদাঁড়ায় একটা মিহি শিহরণ বেশি ডাঙ নামিয়ে দিয়ে গেল। এ কি তবে নিয়তিরই কোনও অশুভ ইঙ্গিত?

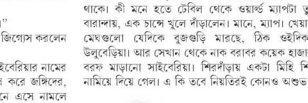

মাঝনের সমস্যা এই যে, চারপাশের জীবন হেবি স্মুদ চলছে। অনেকদিন হল কোনও টারল নেই, সারাদিন ঘুরে 'সোনা' ছাপ গান লোকেরা করা ছাড়া। আজ তার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হয়েছে বলা যায়। দুপুর সবেমাত্র আড়াইটে বাজে, এরই মধ্যে গোসাবা এরিয়া থেকে সে এমন চমকাই গান একযান তুলেছে যে তিনু রাত শুনলে নেচে উঠবেন। মেনলি যাত্রার গান, তবে হিট বেশ সিডি বেরিয়ে গিয়েছে। 'সোনাকে সোনা বলি, মোনাকে মোনা / ওনাকে কী যে বলি তোরা বলে দে না'। এই গান রিলিজের পর গোটা গোসাবা এলাকার রোম্যান্টিক ম্যাপটাই বদলে গিয়েছে। মাঝন সেই হাওয়া গায়ে বেঁধে কলকাতায় ঢোকার সময় দেখল একটা মেয় ছাইব-ছাইব করে বেড়াচ্ছে স্কাইয়ের একদিকে। মনটা ভাল হয়ে উঠল তার। এই গরমে মার্কেটে সচ্ছি বৃষ্টি হলে ভাল হয় তো বেশ আরও ভাল হয় পাড়ায় এট্টু ঝগড়াঝাঁটি হলে। এই নান্থ নিরিমিষ লাইফের চেয়ে ন্যাশপাতির জীবনও ঢের বেটার।

পাড়ায় ঢোকার মুখে যেয়াল করল মাঝন, ওই রোগাটে কোন-ও-কাজের-না ছেলেটা টিটোদের বইয়ের দোকান থেকে মুখ ভার করে বেরোচ্ছে। শালারা এখনও বই-ফই পড়ে। ওই জন্যেই জীবনে কিছু হল না। দেখেই মনে হচ্ছে চুড়ান্ত স্যাড কিছু ঘটে গিয়েছে লাইফে, ক্ষান্নাটা জাস্ট আগের স্টপেজে অপেক্ষা লাগাচ্ছে, এমন অবস্থা। মানুষের দুঃখ দেখলে মাঝন এমনিতেই থাকতে পারে না, মনে হয় গিয়ে নুন ছিটিয়ে কেসটাকে গাঁড়িয়ে দিই। এখানেও সে সেটাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাতিলানা একটা সিন দেখে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে গেল। সে যে আলটপকা কন্সপিরেসিটা শানাচ্ছিল, তার এমন গুন্ডার গ্রাস প্রুফিং যে নিদেন বেলায় হাতে-নাতে পেয়ে যাবে, তা ভাবতেই পারেনি।

টিটোদের দোকানের পিছনটায় একটা খালি জমি আর শেড আছে। সেই

শেডে পাড়ার ছেলেমেয়েরা সাইকেল রেখে কাজে বেরোয়। সেই হাফ অন্ধকার শেডের মধ্যে কোমরে প্রায় কমরিয়া ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো চরিত্র। তার মালিকের মেয়ে লালিল রায় এবং যে-লোকটাকে সে মালিকের রাইভাল হিসেবে অনেকদিন ঘাড়া করবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেই চলেছে, সেই স্যাভো মোহনের ছেলে বাইক বাপি। তার বাইকের অবশ্য চাকা মারা গিয়েছে গুরুবারই, কিন্তু মালটার দম ফুরোয়নি।

আচ্ছা। কেস তাহলে এই শেষপর্যন্ত? উফ্! মাকুর আলটিমেটলি মুখ-ফুখ তুলে চেয়েছেন মাখনের দিকে। এইবার একটা গজগোল বাধবেই বাধবে। আর সেই কলাবস্তু কেলোর গুপেনি পিতেটা কাটবে মাখনই। এমনটা ভাবতে-ভাবতে মাখন তার সস্তার ফোনে দুর থেকে একটা ঘচাক ক্লিক লাগাল। প্রমাণের কোনও পিসি নেই। প্রথমে ইনিয়ে বিনিয়ে বলে কান ভারী করে তোলো, তারপর বিশ্বাস না গেলে ডিরেক্ট ফটো দেখিয়ে দাও। মাখন চোখ বন্ধ করে দেখতে গেল সন্ধের মধ্যে পাড়াটা একটা মিনি পলাশিতে ট্রান্সফর্ম হয়েছে, তলোয়ার হাতে দু'দিক থেকে টাকুসেনা নিয়ে যেয়ে আসছেন হেলমেট পরা স্যাভো মোহন আর তিলু রায়। সেইসঙ্গে আপন-আপন হাতে মিথ্যের বাণী শোনার জন্যে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গুয়েট করছে এই দুই পাপী লাভার। এদের প্রেম আর যা-ই হোক, নিশ্চয়ই বাবারা মেনে নেবেন না। বউদি, মানে ববিতা রায় একটু একটু সস্ত টাইপের, কিন্তু ব্যালেন্স শিট ফেলে দিলেই চুপ। সুতরাং, নো চিন্তা।

মাখন দুপুর-রোদের তাঁদা মুখ থেকে সরিয়ে তিলু রায়ের অট্টালিকায় প্রবেশ করল। রিগেড আর প্যারেড এই সময়ে ছাদের ঘরে মাস্ত খায়, মেনলি ছাগলের। ওই দু'টি প্রাণীকেই দেখার ভয় পায় মাখন, কী করে যে ওদের বাড়িতে ছেড়ে রাখেন এঁরা, কে শালা জানে। কারঘানা থেকে জাস্ট ফিরে দুপুরের খাওয়া নিয়ে চেম্বারে বসতে যাবেন তিলু রায়, এমন সময় যে ক'টা দাঁত পারে বার করে এন্ট্রি মারল মাখন।

"আন দাদা, যেয়ে নিন।"

কথাটা এমন ভাবে মারল মাখন, যেন এটাই তিলু রায়ের লাস্ট খাওয়া। এরপর ডিরেক্ট ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াড।

ভাতের দলাটা মুখে পুরতে গিয়েও হালকা হেজিটেট মেরে থেমে গেলেন তিলু রায়।

"কেন রে, কোনও দুঃসংবাদ আছে নাকি?"

"না না, দুঃসংবাদ আর কী। তবে কিনা, ভাল লাগল না ব্যাপারটা। লালিল মামণিকে সেই ছোট্ট থেকে দেখছি তো...সে যাক গে, আপনি যান। আজ দেখছি আবার কচুর লতি হয়েছে, বাঃ!"

এই ডায়ালগ ডেলিভারির পরে কোনও নরমাল বাপ থেকে পারে না, তিলু রায় তো একন্তা পঞ্চেসিভ তিনি উঠে স্টেট হাত-ফাত ধুয়ে এসে নিজের চেয়ারে সাঁটিয়ে বসে জিগ্যেস করলেন, "খাওয়া পরে হবে। আগে বল, হয়েছেটা কী।"

"আপনার এই রেডি-স্টেডি দিকটা না, পুরো লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মতো। আমার হেবি রেসপেক্ট চলে আসে।"

"তুই বলবি?"

"তেমন কিছু না। তবে কিনা, ওই যে সেদিন বলছিলাম, ওই স্যাভো মোহন লোকটা মোটে আপনার ভাল চায় না, কথাটা ফলে গেল। না সরলে, বিশ্বাস করুন দাদা, আমার চেয়ে হ্যাপি কেউ হতো না। কিন্তু ফলে গেল।"

"পরিষ্কার করে বলবি?"

"আপনি অভয় দিচ্ছেন?"

"তুই বল।"

তিলু রায়ের ধৈর্য জাস্ট ঝাঁপ দেওয়ার আগের মোমেন্টে স্ট্যাঙ্কিং নিয়েছে।

"তেমন কিছুই হয়তো না। কেবল ওই স্যাভো মোহনের বখাটে ছেলেটা..."

"কে, ওই বাপি?"

"হ্যাঁ। ওকে আজকে দেখলাম আমাদের মামণির সঙ্গে। সে দেখতেই পারি। এক পাড়াতে থাকে দু'জন, যাতায়াতের পথে কি আর দেখা হতে পারে না? হতেই পারে। একশোবার পারে। কিন্তু..."

"কিন্তু কীইহইই?"

"মানে, যেখানে দেখলাম, আর যেভাবে দেখলাম, সেটা ঠিক, মানে, ছোটকাকু ইন্টেরেস্টেড বলছি দাদা, ভাল লাগল না।"

"খুলে বল।"

"আরও খুলব?"

কথাটা বলার সময় মাখনের ব্রেনের অলিগলিতে একটা সুজ অর্গ্যাজমের স্রোত বয়ে গেল।

"পুরোটা খুলে বল।"

"ওরা দু'জন, মানে, ওই সাইকেলের শেডে আলাদা করে, মানে একটু কাছাকাছি আর কী...না, মানে, কথাই বলছিল...তবে কিনা...মানে আর কী..."

"মানেটা কীইহইই?"

"বাপি বোধহয় আমাদের মামণিকে লাভ করে।"

একমো কথাটা বলে একটা রোমাঞ্চের গ্যাপ নিল মাখন। তিলু রায়কেও খুরোপুরি রাগার চান্স এবং সময় দিতে হবে। মাখনের গ্যাপ বৃথা গেল না, তিলু রায় তেলে বেগুনে মোটায় এঁচড়ে জ্বলে উঠলেন।

"কী বলছিস কী তুই? বাপি আর আমার লাভলি?"

"সেইটে তো বলছি। মামণি আমাদের বাচ্চা মেয়ে, আত কিছু বোঝে না। আপনি একবার হতভাগা স্যাভো মোহনের স্পর্ধাটা ভাবুন, ও কিনা ছেলেকে লেলিয়ে মামণির মাধ্যমে আপনাকে আঘাত করতে চেয়েছে? আমি বলছিলাম না, স্যাভো লোক ভাল নয়, হতে পারে না। ও আপনার ক্ষতি চায়। আর এর চেয়ে বেশি ক্ষতি আর...এরপর পাড়ায় জানাজানি হলে কী যাচ্ছেতাই হবে একবার ভাবুন তো দাদা! আজ না হয় ফাঁকতালে আমি দেখে ফেলেছি। আমি গুর চোটকাকুর মতো, ঠিকাছে। কিন্তু সবাই তো না, বলুন?"

"তোকে আমি বিশ্বাস করি মাখন। সেটা কখনা নয়। কিন্তু, তুই ভেবে বল। ভুল দেখিসনি তো?"

মাখন এই মোক্ষম মোমেন্টের অপেক্ষাতেই ছিল। হিপ পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও চাইনিজ মোবাইলটা বার করে আনল। চিনারা বরাবরই ইঞ্জিয়ানের ক্ষতি করেছে, আজও একরকম করল। সুজাতা ঠিক যেভাবে বুদ্ধের সামনে পায়েসের পাত্র মেলে ধরেছিলেন হাতের পাতায়, ঠিক সেইভাবেই মাখন ছবিটা বার করে তার চ্যাকব্বি মোবাইলটা আগুন তিলু রায়ের সামনে মেলে ধরল।

ছবিটা দেখার পর তিলু রায় আর চেয়ারে বসে থাকতে পারলেন না।

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ..."

একসঙ্গে অনেকগুলো ছিঃ বলেই চললেন তিনি। মাখন ইন্টেরাপট মারল।

"মাথা ঠান্ডা রাখুন দাদা, মাথা ঠান্ডা রাখুন। মামণিকে আমাদের যেন ভুলেও কিছু বলবেন না। বাচ্চা বয়েস, বাবা-মা'র উপর সেন্টিমেন্ট নিয়ে নিলে অনেক কিছু হয়ে যেতে পারে। বরং আপনি ওই স্যাভো মোহনের এগানেস্টে একটা সেঁপ নিন। ওর বাড়িতে গিয়ে ওকে চুলের মুঠি ধরে শাসিয়ে আসুন। আমিও সঙ্গে যাব।"

তিলু রায় মাখনের কথার আনসার না করে যতটা সম্ভব দ্রুত পায়চারি মারতে লেগেছেন। ব্যাপারটা তাঁর কিছুতেই হজম হচ্ছে না এটা ঠিক। লালিলির জন্যে তিনি সেক্ষ থেকে মেন-মনে গাল ফিচ মেরে রেখেছেন। ডারমন্ড জুয়েলার অসীম মাফিজাঙ ছেলে। কথাবার্তাও বেশ আছে। তার মধ্যে এই বাপি এসে ঢুকে পড়তে পারে, তা তিনি নিজের নাইটমেয়ারেও কল্পনা লাগাতে পারেননি।

তবে কিনা, তিলু রায় বরাবরই মাথা ঠান্ডা লোক, চরম বিপদেও বেস্ট পসিবেল ডিসিশান নেওয়াটা তাঁর ছোট্টবেলার অভ্যেস। তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটাকে এগোতে দেওয়া চলে না।

"রেডি হব দাদা? যাবেন একবার? নইলে এই আমি লিখে দিচ্ছি, ও ছেলে দু'দিনে আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়বে। তখন বিপদ সামলানো আরও মুশকিল হবে।"

"কথাটা তুই হয়তো ভুল বলিসনি মাখন, কিন্তু হড়বড় না করে খুব ঠান্ডা মাথায় কাজ করতে হবে এখন। এক্ষুনি মোহনের সঙ্গে গিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই, তাতে পাড়ায় জানাজানি হয়ে আমার মুখই পুড়বে। আমাকে ভাবতে হবে কী করলে সাপও মরবে, আর লাঠিও ভাঙবে না। ওই বাপি যে কোনও মতেই আমার মেয়ের যোগ্য নয়, সেটা বুঝিয়ে দিতে হবে।"

মনে-মনে এই ঠান্ডা মাথার জন্যে তিলু রায়কে বাছাই খিস্তি মেরে মুখে মাখন বলল, "এই যে আপনি মাথা ঠান্ডা রেখে একেবারে ইন্দিরা গান্ধীর মতো ঠিক ডিসিশনটা নেন দাদা, এর জন্যে আপনাকে খুব রেসপেক্ট হয় আমার।"

তিলু রায় মাখনের কাঁধে হাত চাপড়ে একটা শুকনো হাসলেন। মাখনও ভাবল, ক্যালাকেলি না হোক, এই বাজারে চাট্টি মাইনে বাড়লেও অনেক হয়।

তিলু রায় কর্ডলেসটা তুলে কানে ঠেসলেন, এবং ঠেসে রইলেন

অনেকক্ষণ। প্রথমেই শহরের বিখ্যাত সিকিউরিটি সার্ভিস 'রাতের বেলা'-কে ফোন করে আটজন গার্ড অ্যাপয়েন্ট করে দিলেন, যারা সেদিন রাত থেকেই বাড়ির বাগানে আর গেটে পাহারা দেবে, যাতে কেউ টেসপাস না মারতে পারে। সেকেন্ড, বাড়ির চারকাঠ ডেকে বলে দিলেন, রিগেড আর প্যারেডকে যাইয়ে-নাইয়ে সন্ধে সাতটার পর বাগানে ছেড়ে রাখতে। এবার গুন্দে ফেরোশাসপনা শুরু করার টাইম এসেছে। হৃদয়বিদারক ফোনটা করলেন এর ঠিক পরেই, যেটা তিনি মাইন্ড থেকে ওয়াশিং করেন না কখনওই। বউ বর্বিতাকে ইন্টারকামে ধরলেন। ফোন ধরে "বলো ডার্লিং" বলতেই গুণাশ থেকে তিলু রায় বললেন,

"কাল পরশু যখন অ্যাডলেলেব বাইরের দুটো টিকিট কাটো, হোটেল বুক করাও। লন্ডন, সিঙ্গাপুর, ক্যালিফোর্নিয়া, আই ডোন্ট কেয়ার। ট্র্যাভেল এজেন্টকে বলে করাও। তুমি আর মেয়ে চলে যাও। আমি পারলে পরে জয়েন করব। আর এয়ারপোর্ট যাওয়ার আগে মেয়ে যেন বাড়ি থেকে না বেরোয়। আমি কোনও অশান্তি ছাই না, বাকিটা তুমি বুঝে নাও। ডিটেলে পরে বলছি, বাই।"

মাখন বুঝল, খেলা অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছে। একটু বিমর্ষ হয়েই টিফিন করতে চলে গেল সে। কিন্তু যেটা বুঝল না সেটা হচ্ছে এই যে, দূর থেকে একঝাঁক কালো ক্লাউড এগিয়ে আসছে তাদের দিকে। পা টিপে-টিপে।

এখন কথা হচ্ছে, যে-সিন আলটপকা দেখে ফেলে মাখনের এত নাস্তাই উত্তেজনা এবং যার ইনডিরেক্ট ফলশ্রুতপ তিলু রায়ের রাজপ্রাসাদে রাত থেকে জীবনদার পাহারা বসেছে, সেই সিনে ঠিক কী-কী হয়েছিল, মেনলি ডায়লগ পার্টে, পাঠক হিসেবে সেটা আমাদের জেনে রাখা দরকার।

সেই ট্যাটুরাত থেকেই বাপি হার্ড হয়ে ছিল। এবং সে জানে না, তারও আগে হার্ড হয়ে গিয়েছে তার ফ্রিমার্গাল লাভলি রায়। সে এটাও জানে না যে, লাভলি সফটওয়্যারে প্রায় বিলিভই করে না, মেনলি হার্ডওয়্যার নিয়েই তার কাজ কারবার। এই মমেই দু'জন দু'জনের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যাপার চাইছিল। বাপির বাইক তো গিয়েছে গিয়ে, তাই বিনবাইকেই লাভ পয়েন্ট নির্ধারিত হয়েছিল সাইকেল শেড। যেখানে মাখন ছবিটা বাগায়। কিন্তু সে যদি লাভলি আর বাপির এই কনভারসেশন শুনতে পেত, ডবল মুচ্চো যেত গ্যারান্টেড।

"তুমি বাড়িতে কী বলে এলে?"

"আমি কি নাইটিঙ্গ-এর মেয়ে নাকি যে, বেরনোর সময়ে বাড়িতে কিছু বলে বেরোতে হবে? থাকলে বরং বলি যে আছি, যাতে লাঞ্চ বা ডিনারে সুবিধে হয়।"

"অ।"

"তোমার বাইকটার কী হল?"

"জানোই তো, টায়ার চুরি। আজব কেস।"

"সে তো জানি, কিন্তু সারিয়ে নাও। তাহলে আমরা একটু এদিক-ওদিক..."

"সারানো প্রবলেম। ওই রিম-এর টায়ার নাকি আর মার্কেটে আসে না। এদিকে বাবা নতুন বাইক কিনে দেবে না বলেছে।"

"তাহলে?"

"তাহলে আর কী, আমাদের একটু কষ্ট করেই দেখা করতে হবে।"

"হুম। কিছু ভাবলে?"

"ভাবলাম? কী ব্যাপারে?"

"ইডিয়ট! আমাদের ব্যাপারে।"

"হ্যাঁ, তা ভাবলাম। বলব?"

"বলো।"

"সিরিয়াসলি?"

"না তো কি মজা করে?"

"রাগ করবে না?"

"তোমরা ছেলেরা এত ন্যাকা হও না, ওই জন্যেই কিছু হয় না। থাক, বলতে হবে না।"

"না না, বলছি দাঁড়াও। মানে, আমি একটা জিনিস বুঝেছি। মানে, অনেক আগেই বুঝেছিলাম, পরশু রাতে কনফার্ম হয়েছি।"

"কী বুঝেছ?"

"বলব?"

"উফ্!"

"আচ্ছা। আই লাভ ইউ।"

"কী?"

"বলে দিলাম তো, শুনতে পাওনি?"

"পেয়েছি, কিন্তু..."

"কিন্তু কী, বলো? লাভলি, তুমি আমাকে..."

"তোমাকে কী?"

"লাভ করো না? একটুও? এই যে এত কথা, দেখা, ঘোরাঘুরি, তোমার মনে আমার জন্যে কখনও লাভ আসেনি? সত্যি করে বলো?"

"বলব?"

"প্লিজ?"

"সত্যি বলব?"

"সত্যি বলো।"

"লাভ কিনা জানি না। তবে লাস্ট তো শিওরলি। ইয়েস। লাস্ট।"

"লাভলি, আমি কিন্তু তোমার জীবনে লাস্ট হতে চাইনি। ফার্স্ট হতেই চেয়েছিলাম।"

"উফ্! সেই লাস্ট নয়। ধুর। সব বলে দিতে হয়। এল ইউ এস টি লাস্ট। লাআআআস্ট। বুঝলে?"

"এল ইউ এস টি লাস্ট? এটা তো ভুল বানাম।"

"উঁহু, এ বয়েসে এটাই ঠিক বানান। আমার ডিকশনারিতে এটাই ঠিক বানান বাপি।"

"ও।"

"দেখবে?"

"এখানে?"

"ধুর, ডিকশনারিটা।"

"হ্যাঁ, দেখব।"

"তাহলে আজ রাতে চলে এসো, আমি ওয়েট করব।"

"চলে আসব? কোথায়?"

"কেন, আমাদের বাড়িতে? চেনো না যেন?"

"আরে চিনব না কেন? কিন্তু ডিরেক্ট গিয়ে তোমার বাড়িতে চড়াও হব? তোমার বাবা-মা জানতে পারলে তো আর আস্ত রাখবে না আমাকে।"

"সে তো আমিও আস্ত রাখব না।"

"মানে?"

"ও কিছু না। কিন্তু বাবা-মা জানতে পারবেই বা কেন।"

"না জানিয়ে যাব কী করে?"

"সিম্পল। আমার ঘরটা বাড়ির পিছনের দিকে, বাগানের মুখোমুখি। তুমি সন্ধেবেলা ঢুকলে কেউ দেখতে পাবে না। ছোট পাঁচিল, টপকে চলে আসবে। আমার ঘরের নীচেই একটা দরজা আছে, কেউ ইউজ করে না। আমি খোলাই রাখব। ওটা দিয়ে সোওজা আমার ঘরে।"

"সোওজা তোমার ঘরে?"

"সোওজা আমার ঘরে।"

"তারপর?"

"তারপর লাস্ট। ডিকশনারি।"

"তুমি শিওর?"

"টু হান্ড্রেড পারসেন্ট।"

"উফ্!"

"কী হল?"

"আমি ভাবতে পারছি না।"

"ভেবো না। বেশি ভাবলে কাজ হয় না। এখন আমি যাই?"

"যাবে?"

"যাব না?"

"যাও..."

"রাতে তাহলে আসছ কিন্তু। ওকে?"

"ওকে।"

"বাই..."

"বাই..."

এই ছিল মোটের উপর দু'জনের বার্তালাপ, যা কিনা ওই দূর থেকে

মাথনের কানে ঢোকেনি। যেমন লাভলি বা বাপি কেউই টের পায়নি চায়না মোবাইলের ঘন্টাও। স্বাভাবিক যে এই কনভারসেশনের পর রাত একটু পিচ্চিই নামবে এবং টোটাল ব্যাপারটার একটা কালমিনেশন হবে। কিন্তু বাপি বা লাভলি কেউ ভাবেনি যে, সন্ধের মধ্যে লাভলির বাড়ি ও বাগানের হুলিয়া পাল্টে যাবে এবং লাভলির মোবাইল মিঠেভাবে বাজেয়াপ্ত হবে। ফলে একটা অন্যরকম রাতের টেনশন নিয়ে লাভলি শুঁড়িয়ে রইল বাগানমুখো বুলবারান্দায়, যার ঠিক নিচটায় পায়চারি মারছে চারজন হুমদো গার্ড আর হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্রিগেড-প্যারেড। আজ বাপির একদিন কি নিয়তির একদিন।

রায়পাড়ায় রাত নেমেছে, চারিপাশে জ্বগুনফ্যাঁয়ে সান্নাটা। বাপি বেরিয়েছে বাড়ি থেকে, অভিসারে বেরিন করবে বলে। এমনিতে বাইক ছাড়া তাকে খুব একা দেখালেও, অতটা একা সে নয়। সে করেছে কী, কাঁধের ব্যাগটায় কিছু উটকো ঢিল ভরে নিয়েছে। বাংলা ক্যালেন্ডার সব্বালেই গোখে পড়েছিল, তাতে স্টেট লাল বালিতে লেখা, আজ টোটাল অমাবস্যা। তাতে অবশ্য শহুরে রাস্তাঘাটে এইটা। চারপাশ একেবারে আলোয় মুড়ে লাল্টু করে রেখে দিয়েছে। কিন্তু অমাবস্যার বাজারে কিছু আলো কম করে দিতে পারলে মন্দ কী? সেই প্ল্যানেই ঢিলগুলো কুড়িয়ে রেখেছিল বাপি। লাভলি যতই গ্যারান্টি দিক, আর বাড়ির কেউ দেখে ফেললে আর আস্ত রাখবে না বাপিকে। তাই সে ডিসাইড করে নিয়েছে, হালকার উপর লাইক করে লুকিয়ে চুরিয়ে, লাভলির বাড়ির আশেপাশের লাইটগুলো ঢিল মেরে ভাঙতে ভাঙতে এট্টি নোবো। বাই দ্য টাইম সে বাগানে, চারপাশে ফুটফুটে অমাবস্যা স্যাঙ্কি হয়ে যাবে।

যেমন ধিংকি তেমন ওয়ার্ক। পথ চলতে-চলতে নকুলদানার মতো ঢিল লাগিয়ে-লাগিয়ে আলোগুলো ভাঙতে লাগল বাপি। কাজটা খুব টফ ছিল, কিন্তু লোকজনের তিতিই নজরিয়াকে বিট্টে মেরে যখন লাভলির বাড়ির চারপাশে একটা অন্ধকারের রাস্তা মুড়ে দিতে পারল সে, তখন লাভার হিসেবে নিজেকে অনেক পফেক্ট দিতে ইচ্ছে করছিল বাপির।

আশন্তা অন্ধকারে যখন সে লাভলিদের অনতিইষ্ট পাঁচিলের ধারে পৌঁছল, দেখল একটা নাইট গাউন পরে লাভলি বুলবারান্দায় ওয়েটিং মারছে। মনটা অজানা হ্যাপিনেসে ভরে গেল বাপির। এদিকে লাভলি হাজার হাত নেড়েও বাপিকে বোঝাতে পারল না যে আজ ফোটো, নইলে তুস কেস।

সে যা-ই হোক, বাগানের ভিতরে পায়চারি মারা হুমদো গার্ড আর টেটিয়ে থাকা ব্রিগেড-প্যারেডকে ধাঁ করে দিয়ে বাগানের বর্ডারের লাস্ট লাইটাও ঢিলে ধুলিসাৎ করল ডীক্ষ্ণ লাভার বাপি। এলাকায় এমন স্পিডি অন্ধকার নেমে আসতে দেখে মোটেই ভাল লাগল না সিকিউরিটি গার্ডদের। এভাবে তো কখনও লোডশেডিং হয় না, আজ হচ্ছে কী হল? তারা বাগানের সামনের দিকটায় জড়ো হয়ে আন্তরিক গুজগুজ-ফুসফুস শুরু করল। ব্রিগেড আর প্যারেড বরাবরই পিএনপিসি ভালবাসে, তারাও ল্যা-ল্যা করতে-করতে হাঁটা দিল গুইদিকেই।

এই টোটাল বিপদের মাঝখানে বাপির সঙ্গে সম্পূর্ণ অন্জান অবস্থাতেই এক চান্সে পাঁচিল টপকে বুলবারান্দার নীচের ঘাসে ল্যান্ড করল বাপি। চারপাশে তাকিয়ে অবস্থার ডেঞ্জারাসনেস কিছু বুঝতে পারল না, কারণ গার্ডরা তখনও বাগানের ফ্রন্টে আছে। কিন্তু উপরে তাকাতেই দেখল লাভলি ঝুঁকে পড়ে দিসফিসে গলায় হাত নেড়ে তাকে বলছে, "হুশ! হুশ!" বাপি হাত নেড়ে কী হয়েছে জিগ্যেস করাতেই সে বলল,

"বাবা জেনে গিয়েছে, চারপাশে গার্ড ঘুরছে। তোমাকে হাতে পেলে..."

"গার্ড?"

কোশ্চেনটা করামাত্র বাপি শুনতে পেল, বাগানের সামনে থেকে কয়েকজোড়া বুটের কটরকট মশমশানি সোজা তার দিকে ধেয়ে আসছে। শুনতেই পেল জাস্ট, দেখতে পেল না, কারণ তারই ক্রিয়েট করা ডিপ অন্ধকার। তার মানে তারাও নিশ্চয়ই বাপিকে দেখতে পাচ্ছে না। মশমশের সঙ্গে একজোড়া হ্যা-হ্যা শব্দও শুনতে পেল সে, যেটা ব্রিগেড-প্যারেড—এর হিংস্র মুখ থেকে ঝরে পড়ছে। এই অন্ধকারকে পারফেক্টলি কাজে লাগাতে হবে। এই না ভেবে বাপি প্রচণ্ড স্পিডে বুলবারান্দার নিচের দেওয়ালটা হাতড়ে একটা রোগাটে পাইপ পেয়ে চড়াং করে তার গায়ে লেপটে হাত তিনেক উপরে উঠে পড়ল। ভাগ্যিস উঠে পড়ল, কারণ ঠিক সেই মোমেন্টে মোবাইলে টর্চের আলোর ঝিনকি ছেলে দু'জোড়া গার্ড ওই পথে এগিয়ে এল। তাদের আলো বাপির হাত থেকে দুফুটের দেওয়ালিয়ার কাছে গিয়ে ঠোক্কর খেল।

জাস্ট বেঁচে গিয়ে বাপির রেভারি থিঙ্কিং হয়ে গেল, সে লাভলিকে হতবাক মেরে দিয়ে তিন তড়াকে তার বুলবারান্দার রেলিং ধরে বাইরে থেকে ঝুলতে লাগল। নীচে গার্ড আর কুকুর, উপরে লাভলি, মাঝখানে প্রাণ হাতে নিয়ে লাভার বাপি। এই হল সিন।

"তুমি এভাবে চলে এলে?"

এই প্রথম লাভলির গলায় হতচ্ছন্দার বললে একটা জেন্নুইন আকুতি টের পেল বাপি। লাভলি নিজেও, বলতে নেই, টের পেল সেটা।

"আসব না? আই তো লাভ ইউ। আর তুমি?"

"আই লাস্ট ইউ।"

রিনরিনে-হিশহিশে গলায় বলল লাভলি। সে আরও কী একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আজ বাপির মধ্যে টাইটানিকের লিওনার্দো আর মর্ন-এর অমিতাভ একসঙ্গে ভর করেছে। সে 'যা থাকে কপালে' ভেবে একহাতে রেলিং আঁকড়ে আর-এক হাতে লাভলির ঘাড় চেপে ধরে কাছে টেনে এনে ওই ঝুলন্ত অবস্থাতেই তার ঠোঁটে ঠোঁট গুঁজে দিল। খুব স্লো মোশনে আঠালো জলের সুগন্ধী সমুদ্রে ভেসে পড়ল টাইটানিকে। ডুবে যাওয়াই যার একমাত্র ও শেভনীয় নিয়তি হতে পারে। লাভলির গোলাপি নীচের ঠোঁটটা মুখের মধ্যে নিয়ে যখন চুষছে বাপি, তখন লাভলির ডেভো উপরের ঠোঁটটা তার নাকের নিচ জাগিয়ে তুলছে। আর দুটো ভারী হয়ে আসা জিভ কুস্তির প্যাঁচ দেড়ে যাচ্ছে মুখের ভিতরে। আর এই চরম রিস্কি অবস্থাতেও, জীবনে প্রথমবার ক্লোজলি অনুভব করা কোনও মেয়ের নিশ্বাসের সুগন্ধ আর লালার আঠা বাপিকে প্রায় সেন্সলেস করে আনছে। সম্মোহনের ঠেলায় তার রেলিং আঁকড়ানো হাতটা খসেই যাচ্ছিল, বুবতে পেরে মুখ থেকে ঘটনায় মুখ সরিয়ে এনে বাপিকে দু' হাতে চেপে ধরে লাভলি বলল,

"পড়ে যাবে যে! এসো। বাকিটা ভিতরে বলে।"

বাপিও হিপনোটাইজড বাচ্চার মতো জাদুকর এম লালের পিছন-পিছন ঘুড়ি লাভলির হাত ধরে তার বেডরুমে প্রবেশিল মাদল। গোটা অ্যাঙ্গলটা এমন চোট্টি ছুপে ঘটল যে নীচের ক্যালানে বাহিনী টেরও পেল না। কেবল অন্যরকম একটা ঘেমো মেল পেয়ে বাহুদুয়কে ব্রিগেড আর প্যারেড উতলা হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ফাইনালি টেস না পাওয়ায় থামেলা কিছু পাকায়নি।

বেডরুম টোটাল তৈরিই আছে, সেই দুপুর থেকে লাভলি এই রাতটার ড্রিম মেখেছে। যদিও বিকেলে কেসটা ঘেঁটে যাওয়ায় ভেবেছিল আজ আর নিজের শরীলের মুখে নিরীহ শিঙার ভুলে দিতে পারবে না, কিন্তু মানতেই হচ্ছে, যতই ন্যাস্তাইয়া হোক, ছেলের এলেম আছে। বাপি পুরো জেগে আছে। আর সেই জানকেই আজ কাজে লাগাতে হবে লাভলির।

গোলাপি নাইট গাউনের সঙ্গে ম্যাচ করে আজ তুলতুলিয়া বিছানায় গোলাপি বেডশিট পেতে রেখেছে লাভলি, যে-বেডশিট একটু পরে কুঁচকে কখক হয়ে যাবার কথা। ইন্ডেজাম দেখে বাপি যাকে বলে একেবারে রোমান্ডে টন্ডে টইটম্বুর।

"এ কী কাণ্ড করেছ? এত সাজানো ঘর?"

"শ শ শ শ! আস্তে, কেউ শুনতে পেলে তোমাকে আর ফিরে যেতে হবে না!"

"আমি তো মনে হচ্ছে এমনিও আর ফিরে যেতে পারব না। আজ তোমাকে খুব..."

"খুব...?"

"খুব..."

"আরে কী খুব বলবে তো?"

"হট আর সেক্সি দেখাচ্ছে।"

যত বড় ভোল্টেজের মেয়ে হোক, এ কথা শুনলে ভিতরটায় একটা আগুনের আরশোলা ছুটে বেড়ায় না, এমন কউকে পাওয়া ঢ়ায় আস্তে। কোনও কথা হবে না। বাপি পুরো তৈরি, বুঝে নিল লাভলি। ঘরে মোট তিনটে ফলদেট ডিম আলো জ্বলছে, পোলটিং ডিম। ভাইস্ত মধ্যে বাপি বুঝতে পারল, লাভলির নাইটিটা গোদের উপর টাঙ্গপারেন্ট। ভিতরে তার ডার্ক কালারের রা এবং ডার্ক কালারের প্যান্টিস হাতছানি বাপিকে হার্ড করে তুলছে আস্তে-আস্তে।

গাউনের দু'পাশ থেকে লাভলির হাঁসের ডানার মতো দুটো হাত বেরিয়ে আছে। সেই হিপনো-হাত দিয়ে লাভলি বাপিকে বিছানায় শুয়ে করে ডুবিয়ে তার মুখের ভেতর আর-একবার ঠোঁট ইঞ্জেক্ট করল, এবার লাগল বাপির। সে বুঝতে পারল, লাভলি অনেকদিন না খেয়ে আছে। বাপির ন্যানাঠোঁট ছিবড়ে করে খা নেবার জন্যে লাভলি যখন মুখ তুলল, ততক্ষণে বাপির ঠোঁট থেকে রক্ত গড়ছে। বাপি হাসল, লাভলি জিভ দিয়ে তার রক্ত চেটে দিয়ে বলল, "লাস্ট। এল ইউ এস টি, লাস্ট। মানে তেষ্টা। পিপাসা। আকুতি। বুঝলে এবার?"

বাপির মুখ দিয়ে আর কথা বেরোচ্ছে না। বরং আর কিছুক্ষণ লাভলির এমন পারফরম্যান্স চললে তার যেখান দিয়ে যা বেরোনার কথা, সে কিছুতেই তা আটকে রাখতে পারবে না। আলোগুলো যেন নিজে থেকেই আরও ডিম হয়ে আসছে, এবার কোকিলের ডিম। তারা পরস্পরের জাপটাজপটি মেখে শুয়ে আছে, বাপি দেখল এবারে নিজে স্টেপ না নিলে টেস্ট করার আগেই লাভলি তাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। এমন আগ্রাসী লেডি লাভার সে লাইফেও কল্পনা করেনি। তবে কিনা, বলতে নেই, খারাপ লাগছে না।

বাপি গোলাপি গাউনের কানা ধরতেই লাভলির বাধ্য মেয়ের মতো দু'হাত উপরে তুলল, গাউন খুলে ঘরের কোণে ছুড়ে ফেলে দিল বাপি। সে এখন জীবনের উপ ডীবের সামনে জানা একা হয়ে শুয়ে আছে। এই নাইটো তার জীবনে সত্যিই এসেছে, এটা ভাবতেই কেমন লাগছে যেন তার। সে দেখল, লাভলির কুড়ি বছরের বুকদুটো বেশি বড় নয়, কিন্তু ব্রা-এর আড়াল থেকে তম্বুরি রুটির আভা নিয়ে উঁকি মারছে। চরম ডেসপারেশনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য হনোসেন জড়াচ্ছি করে আছে যেন। তার বেশ কয়েক সেন্টিমিটার নিচে একটা চেরা ফাদা পাদা। উফ! নাভি এমনও হয়? বাপি একটা বউ পেতে চলেছে বটে!

আলো স্বাভাবিক রিজনেই আরও ডিম হয়ে এসেছে, এবার ডিরেক্ট পিপড়ের ডিম। লাভলি সেটুকুও আর না রেখে আলোগুলো নিভিয়ে দিয়ে বাপির পাশে ধপাং করে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। লাভ এবং লাস্টের কাজ এতক্ষণে প্রায় শেষ। লাভলির বুকের বন্টু হয়েনও উঁচু হয়ে আছে, বাপির ভেজা মিনার চলে পড়েছে ঘাসের উপর। বাপির বুকের উপর চলে এসেছে লাভলির শৌখিন সুগন্ধী ব্রা, সেটা বুকে বিছিয়ে রেখেই বাপির চোখ লেগে আসছে। সে শুধু শুনতে পেল,

"একটু রেস্ট নিয়ে নাও, তারপর শুরু করব।"

এই বলে লাভলি একটা চাদর টেনে পাশ ফিরে শুল। তার চোখেও ঘুমের আঠা এন্টি নিচ্ছে।

এই যখন মামলা, তখন অমাবস্যার আশীর্বাদী ডার্কনেসকে ভেদ করে কিছু ছায়ামূর্তি পাঁচিল টপকে তিলু রায়ের প্রেমইসেসে এন্ট্রি মারল। তাদের হাতে টাফ্টু রড, কোমরে ক্লোরোফর্ম। এবং একজনের হাতে গামা সাইজের দুটো ভোড়ার মাংসের গাঁইঁ। ছায়ামূর্তিগুলো ডিরেক্ট ভিতরেই ঢুকে যেত, যদি না বুথতে পারার ফিচার মালিক এন্ডারে পিছন পাকামো করে গার্ড বসিয়েছে। যদিও ওসব তাদের অনেক দেখা আছে এবং স্টকের টোটাল ক্লোরোফর্ম ইউজ করলে গোটা রায়পাড়াকে দু'দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে।

সুতরাং অন্ধকারেই একটা নিভৃত কলিশন হল, সিকিউরিটি গার্ডরা আর যা-ই হোক ক্লোরোফর্ম এবং ভোড়ার মাংসের মোকাবিলা করার মতো নয়। তারা দুঁ শব্দ করার আগে জান-ন্যান হারাল। রইল বাকি রিগেড আর প্যারেড। তারা এমনিতেই বিরক্ত, কারণ জীবনের এই প্রথম ঘরের ভিতর ল্যান না মেরে গরমে বাগানে ডিউটি দিতে হচ্ছে। এমন জানলে কোন শালা গোম মানত। কিন্তু ঠাকুর তাদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন, কারণ এই প্রবল খাটাখাটনির ইভিনিং—এ যথাং কপে দুটো মাংসের চাঙড় তাদের মুখের সামনে নেমে এল। লোকে আটা দিসট ভরতার কারণেও ভাবে যে মালটা দিচ্ছে কে, রিগেড প্যারেড মুখ তুলে তাকানোর কাজটুকুও করল না, তারা ঘতবত করে ভোড়ার শ্রাদ্ধ শুরু করল। বিলকিসদের প্রাইমারি কাজ হাসিল, এবার মেয়েটাকে মুখ পাড়িয়ে চপ্পাং মারতে পারলেই দে দনান দে দনান। বাইরে মিনি ভ্যান নিয়ে ড্রাইভার দাঁড়িয়ে, উঠলেই ফোর্থ গিয়ার।

কিন্তু খুজবারাজার নীচের পাইপ বেয়ে লাভলির ঘরে পা টিপে ঢুকে এসে একটা হালকার উপর লাইট করে কেস যেন বিলকিস আর তার বুঁ যাকরে (নেট বনা ও মনা)। বহু চপ চু বটাম অন্ধকার। তবে যা মনে হচ্ছে, এই ডিপ রাতের বেলা মেয়েটা বিছানাতেই গড়াগড়ি যাবে। বড়ি নির্ঘাৎ শুয়ে আছে বেডে। এমন অবস্থা যেরকম, তাতে দশাস করে টর্চ জ্বেলে দেলাটা ক্যালানের কর্ম হবে।

অনেক ভেবে বিলকিস একটা চতুর রুট আবিষ্কার করল। নিজেরা নাকে রুমাল চেপে সারা ঘরময় ক্লোরোফর্ম স্প্রে করে দিতে না দিতেই বাপি আর লাভলি আগামী বারো ঘন্টার জন্যে নেতিয়ে পালং শাক হয়ে গেল। বিলকিস অবশ্য বুঝল না এক তিরে দুই বার্ড ঘায়েল করেছে সে।

এবার চিতে যেলতে হবে। কোনও ব্যাপার না, প্রাইমারিল বিছানার বাঁ দিকে গিয়েই শিকারের তুলতুলে পার্টি হাতে লাগল বিলকিসের। কিন্তু এটা এনজয়ের সময় নয়। গরম বডিটাকে কাঁধে ফেলে নেমে এল বিলকিসের টিম, এক মাঁচে পৌঁছল ব্রুস করে ভাইন নিয়ে হাওয়া। রিগেড আর প্যারেড তখন সবে হাফ মাসে মেরেছে।

তিলু রায়ের নিথুম অন্ধকার বাগানে একটা অপরাধ ঘটে গেল সাইলেন্টলি। আর কিছু না, জাস্ট একবার মেঘ ডাকল। জোরে।

পরদিন সকালে, বলতে নেই, পাড়ার হুলিয়া ফুল চেঞ্জ। সেটা অবশ্য হবারই কথা, গত নাইটে এতবড় একটা কিডন্যাপিং-এর পর সবকিছু যে কে সেই থাকবে, পাড়াটাকে এতটাও ন্যাতানো ভাবা অন্যায়। কিন্তু যা হওয়ার ছিল, তার উল্টোই হল। সকাল বারোটা অব্দি ঘুমিয়ে করার পর পাড়ার বিভিন্ন জায়গায় চুম্বার হইহই শুরু হল স্যান্ডো মোহনের। খুব তাঁর বলগেম নয়, যে-কোনও বিপদেই তিনি ডাগর হন্তার ছেড়ে থাকেন, আজও তাই ছাড়ছেন। ব্যাপার আর কিছুই নয়, কাল রাত থেকেই তাঁর ছেলেকে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে গোডাউন থেকে বহু লেট করে দেহায় সেটা আর যেয়াল করেননি তিনি, কিন্তু আজ সকালে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দ্যাখেন ছেলে ঘরে নেই। তাকে ফোন লাগাতে গিয়ে দ্যাখেন ফোন টাটু। বাইক বাপি এমনটা করার ছেলেই নয়, সুতরাং এক চান্সেই তিনি ধরে নিয়েছেন তাঁর ছেলের কোনও বড় রকম ডেঞ্জার হয়েছে এবং সেই মর্মে পাড়ার লোকজনের সঙ্গে চিৎখার-চেঁচামেচি মারছেন, পাশাপাশি এনকোয়ারিও চালাচ্ছেন। এরপর পুলিশে যাবেন।

কথা তিনি ভুল ভাবেননি, ছেলে তাঁর গাপ হয়েছে ঠিকই। গতকাল বাপি ও লাভলির লাভ মেকিং-এর হাফ টাইমে কিছু দুষ্কৃতী, যেমন আমরা দেখেছি, গা টিপে-টিপে এসে তাকে পীজাকোলা করে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা হয়েছে কী, ওই গুন্ডুলিপ অন্ধকারে বিলকিসের হাত গিয়ে স্ট্রেট পড়েছে বাপির বুকের উপর এলিয়ে থাকা লাভলির নগ্ন ব্রা-এর উপর। ব্যাস, ফুল দশরথের অন্ধমুনি কেস। এত দেশে-ফেশে অজ্ঞান-ফজ্ঞান মারিয়ে শেষমেশ ভুল আইটেম ক্যাপচার করে নিয়ে হাওয়া। সে প্রবলেম অবশ্য তাদের এবং সে খবর একটু পরেই এই নভেলে এসে পৌঁছবে, কিন্তু তার আগে রায়পাড়ার অবস্থা তো তড়াক হয়ে রয়েছে।

এদিকে তিলু রায়ের বাড়িতেও অশান্তি চরমে, কারণ ভোরবেলাই তিনি ডিসকভার করেছেন গার্ডেরা সব ডবল লাট এবং রিগেড আর প্যারেড চরম মাসে যেয়ে পেটখারাপ বাধিয়ে বসে আছে। মানে খুব ক্লিয়ার, কেউ বা কারা এন্ট্রি নিয়েছিল। তারপর বর্বিতা বাইরে থেকে মেয়ের ঘরের দরজা খুলে পিকচার দেখার পর আরও চরম খবর রিয়ালাইজ করেন তিলু রায়, কাল রাতে ওই বাপি হতভাগা তার মেয়ের ঘরে ছিল, এবং ছিল শুধু নয়, এনাফ ফাইনাই করে তবে গিয়েছে। মেয়েকে গুপেন ইউনিভার্সিটির মতো পড়ে থাকতে দেখে ফার্সে বর্বিতা আঁতকে উঠেছিলেন ঠিকই, কিন্তু মনে-মনে হালকার উপর লাইট করে হাগিয়ে এই ভেবে যে মেয়েও তাঁর মতোই কুড়িতেই কামাল করছে। ঘুমন্ত মেয়েকে টেনেচুনে টি-শার্ট আর ক্যাপ্রি গলিয়ে এসে তিলু রায়কে ঘরে ডেকে নিয়ে যান তিনি। তখন তিলু রায়ের মেজাজ সপ্তমে। তারপর যখন বুঝতে পারলেন এত ভন্যাইই ব্যাবস্থা সত্ত্বেও ওই বাইক বাপি তাঁর তার মেয়েকে লুন্ঠন করতে এসেছিল এবং করেও গিয়েছে (তাঁর মেয়েও যথেষ্ট লুন্ঠনকারী হতে পারে সে আজ্ঞাপ তাঁর ছিল, কিন্তু এখানে সেটা কথা নয়) তখন তিনি রাগ সামলে রাখতে পারলেন না। মনে-মনে দুরদর্শী মাথনের মাইনে বাড়ানোর কথা ভাবলেন আর প্রমিশিং নিলেন, একটু পরেই স্যান্ডো মোহনকে নিয়ে ডিরেক্ট পুলিশের কাছে যেতে হবে। এখানে আমাদের মনে সরল কোশ্চেন জাগতেই পারে, তিলু রায় এতরকম লুতসাইয়ের মধ্যে কী করে স্যান্থ্রম মারলেন যে মোহনের ছেলে বাপিই গতনাইটে মজা মারতে তাঁর মেয়ের রুমে পা ফেলেছিল? ইজি! ঘুমন্ত লাভলির অপার্থিব তুলতুলে ডান পায়ের গোড়ালিতে বিঁধে আছে জ্বালজ্বালে

একটি তপ্ত জাঙ্গিয়া, যা স্যান্ডো মোহনের কোম্পানিতে তৈরি। এখন এ কথা সবাই জানে যে এই এলাকায় মোহনের গেঞ্জি-জাঙ্গিয়া সে নিজে আর তার ছেলে ছাড়া কেউ ইউজ করতে সাহস পায় না। সুতরাং বাপি ইজ় ইন্যুয়াল টু শিশুর সাসপেক্ট।

এরই মধ্যে মাখন এন্ট্রি নিয়েছে। নিজের নন্ত্রাদামুপনা দেখে হাসবে না কাঁদবে ভেবে পাচ্ছে না। মোমেন্টের মধ্যে স্যান্ডো মোহনের নামে বাকি বিষ্টুকু তিলু রায়ের কাছে ঢেলে দিল সে। আর দেরি নয়। মাখনকে নিয়ে রোদ্দমারা দেবার মধ্যেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন স্যান্ডো মোহনের উদ্দেশে। তখনও তিনি জানেন না বাপি গাণ হয়েছে। ফলে সে এক মাযোমাযো সিচুয়েশন।

স্যান্ডো মোহন লুঙ্গি ভাঁজ করে দক্ষিণী ভিলেনদের মতো বেপরোয়া মুড নিয়ে পাড়া পেরোচ্ছেন, এমন সময়ে তিলু রায়ের (উইথ মাখন) সঙ্গে একটা গলম মোলাকাত হয়ে গেল। এবং হওয়ামাত্র তিলু রায় তোপটা পাগলেন।

"আপনার ছেলেকে আমি আলদলতে নিয়ে যাব।"

"হোয়টঃ? আমি মরছি আমার জ্বালায়, তার মধ্যে আপনি এসব কী বলছেন উল্টোপাল্টা?"

"উল্টোপাল্টা, অ্যাঁঃ? উল্টোপাল্টাঃ? ছেলেকে বখে যেতে দেওয়ার সময়ে মনে ছিল না? এখন দেখুন কী হয়। জাস্ট দেখুন একবার।"

"বখে যেতেঃ? আমার ছেলের মতো বাধ্য ছেলে আপনি গোটা এলাকায় পাবেন? দাঁড়ান-দাঁড়ান, আমি হঠাৎ আপনাকে কেফিয়তই বা দিচ্ছি কেন? আমার তো ব্যাপারটা উল্টো-সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে।"

"সন্দেহজনক তো বটেই। কোথায় আপনার গুধধর ছেলে? তাকে বার করুন। পুলিশে দেব আমি।"

"আরে মশাই আমিও তো তাই জানতে চাইছি, আমার ছেলে কোথায়ঃ?"

"আহা, যেন কিছুই জানে না।"

"জানি না-ই তো। আপনি বলুন, আপনি কী জানেন, শুনি একবার?"

ইতিমধ্যে মাখনের মাথায় সবুজ অর্গ্যাজ়ম চালু হয়ে গিয়েছে এবং দুই বগড়ুটেকে সেন্টার বানিয়ে পাড়ার লোকজন গুজুর-গুজুর মোডে জড়ো হয়েছে। তাদের মধ্যে সঞ্জয় সোম, লোকেন সেন, কুমারকীর্তন, আদু চৌধুরি, ঢফি দে বা বিলিতি বোস নেই বলে মিথ্যে বলা হবে। বিলিতি ব্যাপারটা বোধহয় চেষ্টা করছেন, যদিও এ-ও জানেন যে এইসব লোবাল মামলায় হাত মাযাতে পারবেন না তিনি, অন্তত টুডো। আজ তিনি আত্মজ্ঞতিত ঘনঘটায় মজে। রাতে প্রাস্ট দেশকে একবার উদ্ধার করে নিয়ে আসতে হবে, এই যা। গুদিকে তিলু রায় আর স্যান্ডো মোহনের গলা চড়েই চলেছে।

"শুনবেনঃ শুনতে চান আপনার ছেলের কীর্তিঃ"

"আরে ওযন থেকে বকবক করছেন, বলুন না মশায় কী ব্যাপার।"

"সবার সামনে বলতেও আমার লজ্জা করে, সে কাল রাতে পাঁচিল টপকে আমার মেয়ের বেডরুমে ঢুকেছিল। ঢোকার সময়ে বাড়ির গার্ডদের ক্লোরোফর্ম দিয়ে সেন্সলেস করে। তারা এখনও আমার বাগানে পড়ে আছে। তারপর আমার মেয়েকে একলা পেয়ে...ছিঃ ছিঃ ছিঃ...শেষে যাওয়ার সময়ে মেয়েটাকেও অজ্ঞান করে দিয়ে গিয়েছে। ছিঃ! এই আপনার শিক্ষা? আমি পুলিশে যাব। আলদতে যাব।"

"দাঁড়ান-দাঁড়ান। আমার ছেলে কাল রাতে আপনার বাড়িতে ছিল?"

"বললাম তো তার কাণ্ডকারখানা। আবার বড় মুখে জিগ্যেস করছেন?"

"আপনি শিওর যে সে-ই ছিল?"

পাছে বরকার হয়, একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে বাপির ছেড়ে রাখা জাঙ্গিয়াটা মাখনের হাতে ধরিয়ে এনেছেন তিলু রায়। মাখন তীর্থযাত্রীর মতো পবিত্র মুখ করে সেটা ধরেছিল। তিলু রায় নাক সিঁটকে সেটা হাতে তুলে লেলালেন স্যান্ডো মোহনের সামনে, "এই যে আপনার কোম্পানির জাঙ্গি জাঙ্গিয়া। কাল রাতে আমার মেয়ের ঘর থেকে পাওয়া গিয়েছে। এতেও যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে ওই ভিতরে যা লেগে-টেগে আছে, সব ফরেনসিকে যাবে, তখন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বলুন, এই জাঙ্গিয়া আপনার ছেলের কিনা?"

"শুনুন মশায়, জোয়ান ছেলের জাঙ্গিয়া চেক করে রাখাটা আমাদের ফ্যামিলির চল না। কিন্তু যদি ধরেই নিই যে যদি কোনও কারণে আপনার বাড়িতে কাল রাতে ঢুকেছিল, তাহলে আমিও পুলিশে যাব, আলদতে যাব। এবং একা নয়। আপনাকে নিয়ে যাব।"

"মানে?"

"মানে আজ সকাল থেকে বাপির কোথাও কোনও খোঁজ নেই। ফোন বন্ধ। ছেলেটার যে কী হল...আপনারা শিশুরই তাকে..."

বলতে-বলতে অত বড় ফিগারের দোর্দণ্ড স্যান্ডো মোহন হঠাৎ ভ্যাঁ করে উইপিং শুরু করলেন। আর কে না জানে, কান্না হাঁচি আর হাই-এর মতো ছোঁয়াচে কেস খুব কম আছে। তিলু রায়ের বিরাট শরীরের মধ্যে রাগের গরগর পাহাড় ঢেলে একটা ভুকম্পযৌগানি ভকম্বক করে উপরকিকে উঠে আসতে লাগল। মাখন বুঝল, কেস অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। সে তিলু রায়কে সামলাতে যাবে, তার আগেই তিনি 'আমার মেয়েটার কী সর্বনোশ যে হয়ে গেল' বলে গুপেনকারা মেরে দিলেন।

টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হল, তার সঙ্গে পাড়ার দুই বয়স্ক পুরুষ সিংহের অমায়িক কান্না। এ এক আজব সিন যা এর আগে রায়পাড়া কোনওদিন দেখেনি। গলতা বুঝে টিপি পায়ে বিলিতি বোস এগিয়ে এসে সাইমালটেনিয়াসলি দু'জনের পিঠে ভরসার হ্যান্ড রাখলেন। তারপর বললেন, "শুনুন, এখন নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করে লাভ নেই। আগে আমাদের বুঝতে হবে বাপির সঙ্গে ঠিক কী হয়েছে। লাভলির জান ফিরলে অনেক কিছু জানা যাবে, কিন্তু ক্লোরোফর্মের এফেক্ট অনেক সময়ে ২৪ ঘণ্টাও থাকে। তার আগেই পুলিশে যাওয়া উচিত।"

তিলু রায় সামলে উঠে গম্ভীর বিরক্ত ফেস নিয়ে দাঁড়িয়ে, বিলিতির কথা শুনে চোখের ডবকা জল মুছে স্যান্ডো মোহন বললেন, "পুলিশ না। আপনি। আপনি পাবেন আমাদের হেল্প করতে। আপনি সারাদিন পাড়ায় ফালতু বেকার ঘাঁট জ্বালানো বাতিল লোকের মতো ঘুরে বেড়ান ঠিকই, কিন্তু আমরা জানি ভটা আপনার ছদ্মবেশ। আপনি আসলে..."

সেনটেন্স কমপ্লিট করার আগেই স্যান্ডো মোহনের মোবাইল বেজে উঠল। চারপাশে গভীর সাল্লাট। আকাশে মেঘের ডাক, পকেটে মোবাইল। স্যান্ডো মোহন কাঁপা-কাঁপা হাতে মোবাইলটা কানে দিলেন। তারপর যা শুনলেন, তাতে তাঁর হাড় হিম হয়ে গেল।

স্যান্ডো মোহনের মোবাইলে কড়াৎ করাটা যে-লোকেশন থেকে এল, একটু আগে থেকে সেই লোকেশনটা বুঝে নিলে আমাদের ফলো টানতে সুবিধে হবে। সকাল থেকে অশান্তি সেখানেও কিছু কম হয়নি। শালিমার শিপইয়ার্ডের একটা কাঠ চেরাই গ্রাম পেরেক পেটাইয়ের তেকোনা শেড-এর ভিতরে গত নাইটে ঢুকে পড়েছিল বিলকিস, সঙ্গে তার দুই শাকরেদ এবং কিডন্যাপ্‌ড ল্যাংটো বাপি, যাকে তারা সারা রাস্তা বিরাট বড়লোক তিলু রায়ের ওখানে নিয়ে লাভলি ভেবে এসেছিল। ধনা-মনা গুই শেড-এই চিকেন তন্দুরি ছড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল আটচা নাগাদ। এন্ট্রি মেরে বাপির হাত-পা অন্ধকারেই বেঁধে রেখে পাঁইচ চমকেছিল বিলকিস, ফলে ঐতিহাসিক গলতিটা কারওরই নজরে পড়েনি। পড়ল ডিরেক্ট সকালবেলা, যখন ছোটা মহেন্দ্র লোকেশনে এন্ট্রি নিল।

"বস, মাল রেডি, দেখেই আপকা দিলখুশ হয়ে যাবে।"

দেখার আগেই বস ছোটা মহেন্দ্র গর্বে টাচু হয়ে যোগ্য উত্তরসূরি বিলকিসকে একবার জগাইজপাঁয়ায় আঁকড়ে ধরে শাবাশি দিয়ে নিল। তারপর শেড-এ ঢুকে অল হী।

একটা বছর বাইশের রোগাটে ছেলে সম্পূর্ণ ন্যুড অবস্থায় কেলিয়ে পড়ে আছে।

"এ কী রে? এটা কে?"

বুকের বাঁদিকে হাত রেখে অ্যাটাক সামলে চেঁচিয়ে উঠল ছোটা মহেন্দ্র। তক্ষণেৎ বিলকিসের তো মাথায় উঠে গিয়েছে। হাট নয়।

"ও তুই কাকে উঠিয়ে দিলে এলি রে বিলকিস? এ তো সালা ছোকরিও নয়। ওই তিলুর ছেলো আছে?"

"মানে...না তো বস। তিলুর তো সির্ফ এক লড়কি।"

"তাহলে এ সালা কে?"

"ইয়ে তো দেখছি বস সেই লড়কির লাভারটা, যার বাইকের আমি চাক্কা খুলিয়ে নিয়েছিলাম।"

"তা এ এখানে কী মারাচ্ছে রে! মেয়ে কইঃ"

"কী বলব বস, কাল ওই লড়কির ঘর থেকে তো লড়কিকেই তুলে নিয়ে এলাম।"

"আর সে এখানে এসে লড়কা হয়ে গেল? এ কি মাদারিকা খেল বিলকিস? তুই মুখ দেখে মিলিয়ে এনেছিলি?"

"অন্ধেরা ছিল বস, লাইট জ্বাললে কিছুইন হতো। মুখ তো দেখিনি, কিন্তু বুক দেখে দিয়ে এসেছিলাম, গ্যারান্টি।"

"বুক দেখে? মানে?"

"মানে বুকের কাছে হাথ মারতেই দেখলাম কী দুটো উঁচু-উঁচু হয়ে আছে, বস, উঠিয়ে নিয়ে চলে এলাম।"

"তো উঁচু-উঁচু দুটো বুক কোথায় গেল?"

"কীভাবে মিসটেক হল বুঝতে পারছি না বস।"

"সালা একটা কাজ যদি ঠিকভাবে হয় তোদের দিয়ে। বলেছিলাম আমি যাই, আমি যাই। তা না, উনি সব সামলে নিবেন। এখন সামলা! এই মালটা কার ঘরের কী কে জানে, ডিরেক্ট তুলে পিস উঠিয়ে নিয়ে এলি। এখন রিটার্নও হবে না, আমরাও বসে-বসে চুষব। এই ধনা-মনা, আগে মালটার বাঁটুটা ঢাকা সালা ক্লোরোফর্মের মধ্যেও লাফিয়ে উঠছে। খুব মজজ মেরেছে সালা কাল রাতে, আর এখন আমাদের মারছে।"

ধনা-মনা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেট নিয়ে এসে অজ্ঞান বাপির ওখানে পরিয়ে দিল। ফলও হল কী, প্যাকেটটা থেকে-থেকে চড়মড়িয়ে উঠতে লাগল।

"এখন বল বিলকিস, করবটা কী?"

"দাঁড়াও বস, আমাদের খবরিকে একটা ফোন লাগাই, ওর কাছে সালা এই ছেলের বাবার নম্বর থাকবে। লড়কি নহী তো লড়কা সহি। বাপকে মাল্লু তো ছাড়তেই হবে। আর ওর বাপটাও বিজনেসম্যান আছে।"

এরপর বিলকিস সেই লোকটাকে ফোন লাগাল যে এই গুজুগারমের মধ্যে কালো ওভারকোটে আর টুপি পরে দুবগিন হাতে চক্কর মারছিল। সে দেন অ্যান্ড দেয়ার বিলকিসকে স্যাভো মোহনের নম্বর সাপ্লাই মেরে দিল। ব্যাপারটা আর বিলকিসের হাতে ছাড়তে চাইল না ছোটা মহেশ্রা। তাকা চাওয়ার জুমিকাটা সে নিজেই হ্যান্ডল করতে চায়। লাগাল এক ফোন। ওপাশ থেকে ধরামাত্র হ্যালোর অপেক্ষা না করেই আসলি বাত দেগে দিল সে। ফোনের ওপারে তখন স্যাভো মোহন।

"শোন, তোর ছেলে আমাদের কব্জায় আছে।"

"অ্যাঁ, সে কী?"

"চুপচাপ শোন।"

"বল। আই মিন, বলুন স্যার।"

"আমরা জানি তুই ব্যবসা করিস। ছেলেকে বাঁচাতে চাস?"

"কে না চায়।"

"তাহলে আজ রাত ঠিক আটটায় দশ লাখ টাকা একটা সুটকেসে পুরে শালিমার শিপইয়ার্ডের ওয়েস্ট গেট দিয়ে ঢুকে আয়। ডানদিক থেকে তিন নম্বর ঘরে ঢুকে দেখবি একটা টেবিল রাখা আছে। তার উপর টাকাটা রেখে পিছন দিকে টার্ন না করে চুপচাপ বাড়ি ফিরে যাবি। টাকা ঠিকঠাক থাকলে তোর ছেলে পরদিন সকালে ওয়ান পিসে ঘরে ফিরে যাবে।"

"আ-আ-আচ্ছা।"

"আর যদি না হয়..."

"যদি না হয়...?"

"তাহলে ছেলেকে কেটে প্লাস্টিকে মুড়ে পাঠিয়ে দেব।"

"না-না স্যার, এসব বলবেন না, ছেলেকে আমার চাই।"

"গুড। আমারও টাকা চাই।"

"বলছিলাম কী স্যার, একটু কম করলে হতো না? আমি কিন্তু অত বড় ব্যবসায়ী নই।"

"চোপ! সালা আজিব আদমি! ছেলে নিয়েও দর কষছিস? টাকা কম হলে ছেলেও একটু কম-কম ফিরত পাবি। ধর একটা কান নেই আর ডানদিকের পাছা কাটা। চলবে?"

কথাটা শুনে ডরল শিডরে উঠলেন মোহন।

"না-না, দেব-দেব। আচ্ছা শুনুন না, আমার কাছে এখন পাঁচ লাখ মতো আছে। বাকিটা ওইভেই পে করলে হবে?"

"ওইভেই? মতলব?"

"মানে বাকি পাঁচ লাখ টাকার গেজি জাঙ্গিয়া দিয়ে দেব। চলবে?"

"তেরি মা কি আঁখ।"

এই বলে ছোটা মহেশ্রা ফোন রাখল। স্যাভো মোহন কাঁরা কন্ট্রোল মেরে গোটা কনভারসেশনটা খুলে বললেন পারলিকলি।

"শালিমার শিপইয়ার্ড স্ট্রেঞ্জ।"

কথাটা ন্যাচেরাল কারণেই বিলিতি বোসের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল। কোইনসিডেন্সেরও একটা লিমিট থাকে!

"কেন, শালিমার শিপইয়ার্ড হতে পারে না?"

স্যাভো মোহন জিগ্যেস করলেন।

"হতেই পারে...ও আপনি বুঝবেন না। শুনুন, পুলিশে খবর দিলে ঝামেলা বাড়বে। আপনার কি আমার আর আমার টিমের উপর আস্থা আছে?"

"খুব আছে। আপনি যা বলবেন তাই করব। আমার শুধু ছেলেকে দেরত চাই, ব্যাস।"

"তাহলে শুনুন। আজ রাতে আমি আর আমার মুল টিম একটা অপারেশন কাজার করতে শালিমার শিপইয়ার্ডে এমনিতেই যাব। এক ঢিলে দু'পাখি হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। আপনি শুধু টাকাটা অ্যারেঞ্জ করে রাখবেন। ওইটা নিয়ে কন্ট্যোমাইঞ্জ করাটা ঠিক হবে না।"

"সে তো জানি, কিন্তু সত্যি আমার কাছে এখন পাঁচ লাখের বেশি নেই। কী যে হবে..."

"আমার কাছে আছে।"

সবাইকে চমকে দিয়ে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সেনটেন্সটা এল তিলু রায়ের কাছ থেকে, যিনি এতক্ষণ সাইলেন্স খেলছিলেন। মাথন টেরিট্রি চমক নিয়ে তাকাল তার মালিকের দিকে।

"আ-আ-আপনি?"

যোল বাপির বাবা স্যাভো মোহনও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

"হ্যাঁ আমি। বাকি পাঁচ লাখ আপনি এখন আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন, পরে সুবিধেমতো দিয়ে দেবেন 'খন। শুনুন মশাই, আপনার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের কী হয়েছে, সেসব পরে দেখা যাবে, আমার মেয়ের জান ফিরলে জানাও যাবে অনেক কিছু। কিন্তু এখন আপনি যে বিপদে আছেন, তাতে পাশে দাঁড়ানো ছাড়া তো উপায় দেখছি না। আপনি নিজের বাড়িতে যান, আমি টাকাটা ক্যাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি দুপুরের মধ্যে। আর হ্যাঁ বিলিতিবাবু, রাতে কিন্তু আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব। আপত্তি নেই তো?"

বিলিতিকে আনসারের চান্স না দিয়ে তিলু রায়কে গলম জড়িয়ে ধরে আবেক রাউন্ড কেঁদে নিলেন স্যাভো মোহন। সঙ্গলে হাততালি, কুমারকীর্তনের আঁখে ওয়াটার। কেবল তিলু রায়ের কানের কাছে মুখ এনে কিসফিস করে মাথন বলে উঠল, "আপনার এই এনিমিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়াটা না, একেবারে মাদার টেরিজার মতো। এইজন্যে আপনাকে কী যে রেসপেক্ট হয় আমার..."

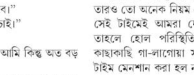

বোঝাই যাচ্ছে, ব্যাপার এবার কালমিনেশনের দিকে এগোচ্ছে। কিন্তু তারও তো অনেক নিয়ম এবং স্টেপ আছে, সুতরাং হাতে এট্টু টাইম আছে। সেই টাইমেই আমরা দেখে নেবো চট্টজলি চারখানা ডেভেলাপমেন্ট। তাহলে হোল পরিস্থিতিটা বুঝতে আমাদের সুবিধে হবে। মোটামুটি কাছাকাছি গা-লাগোয়া সময়েই ঘটছে ব্যাপারগুলো, তাই আলাদা করে টাইম মেনশান করা হল না। তাতে অবশ্য ক্ষতি কিছু নেই।

এক

অনিমেষ ধর তৈরি হচ্ছেন মনে-মনে, বডিতে-বডিতে এবং টিমে-টিমে। মোটের উপর ভালই টিম সাজিয়েছেন তিনি, ব্রাজিলের মতো তিন-চার-চার ছকে। লিড অবশ্যই তিনি নিজে নেবেন, এই বয়েসে সুপার এনকাউন্টারের দায়িত্ব পেয়ে যাবে বলে একেবারে চেগে উঠেছেন। বাড়ি থেকে সকালে বেরনোর টাইমে সর্বমঙ্গলা একবার হাঙ্কার উপর লাইট করে বার-চার সেরেছিলেন, গেইন কিছু হয়নি। 'ফিরে এলে দেখা হবে' মার্কা একটা মনমাতু ডায়লগ দিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছেন অনিমেষ।

টোটাল একদিন লেট করেই রাশিয়ানদের কাছে দর বাড়িয়ে নেওয়া গিয়েছে, তারা নিশ্চয়ই আজ দুপুর নাগাদ ওয়েট করে হেদিয়ে গিয়ে তেল-ফেল আবিষ্কারের চেষ্টায় লেগেছে। সেই মোমেন্টে, যখন তারা ক্লান্ত এবং

বিরজ, জাস্ট অ্যাটাকটা করে সালটে নিতে হবে। এই হচ্ছে অনিমেষ ধরের ফুল প্রুফ প্ল্যান।

সুতরাং রাত ন'টা নাগাদ হেলেকপ্টেল সিনে ঢুকলেই কাজ হবে, চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে রাশিয়ানদের জালে তোলাটা বিশেষ ঝামেলা হবে না। হিসেব কষে দেখলেন অনিমেষ, পরমবীরচক্র পেতে দিন দশেক লাগবে। তার আগে একবার শিমলা বেড়িয়ে আসবেন দু'জনে। ওখানে ঠান্ডায় জব্দব লাগাইল্যুট হবে।

দুই

এক্কার মন-না-মানা বিরক্তি নিয়ে মুখ ভেপসে শিপইয়ার্ডের ঘরটায় পিল্লল হাতে মাছি তাড়াচ্ছে ছোটা মহেন্দ্র। মনা-ধনা প্যাক করে আনা সমস্ত খাবার খেয়ে লুটিয়ে পড়ে আছে, বিলকিস তার দুই শাকরেদকে নিয়ে চারপাশটা দেখে ফিরে এল জাস্ট। এরই মধ্যে বাইক বাপির ক্লোরোমুখ ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছে। হাত বাঁধা, বাকু প্যাকেটবন্দি, মনভর্তি লাভলির নাইটস্মৃতি। এইরকম বেখাপ্পা কম্বিনেশনে সে এর আগে কখনও পড়েনি। তবে কিডন্যাপড হয়েছে এটা বোঝামাত্র 'আমি বাবার কাছে যাবোও ও ও' বলে কান্না জুড়েছিল, তাতে তাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের কান্না ছোটা মহেন্দ্রর হজম হয় না।

চারপাশটা নজর মেরে মুখনিচু বিলকিস ফিরে এলে ছোটা মহেন্দ্র একবার প্ল্যানটা ঝালিয়ে নিল ভাল করে। ইডিনি হতে না হতেই তারা মুখ রেডি থাকবে। এবার আর কোনও ভুলচুক নয়। ডানদিকের তিন নম্বর ঘর, যেটাতে স্যাভো মোহনসে সুটকেস রেখে যেতে হুকুম দেওয়া আছে, তার পিছনদিকটায় দুই শাকরেদ নিয়ে হাইডিং থাকবে বিলকিস। ওরা যদি ধামেলা না করে মাল রেখে চলে যায় তো আচ্ছা, কোনও কথা হবে না। ততক্ষণ এই শেডেই ন্যানো বাপিকে নিয়ে যাবে পাহারা লাগাবে ছোটা মহেন্দ্র। কথা মতো যথারীতি আউট, তাই গুলে নিয়ে কোনও প্ল্যান নেই। কিন্তু পার্টি যদি বেগড়বাঁই করে, যদি পুলিশ বা লোকাল অ্যান্টি সোশ্যালদের নিয়ে ঢোকে, তাহলে তাদেরই একদিন কী ছোটা মহেন্দ্রই একদিন। গোলাগুলি তো চলবেই, আরও না জানি কী-কী হবে। তবে হ্যাঁ, মালবট্টি কিক্যাক পেয়ে গেলে পরদিন একটা সস্তার পাঞ্জাবি ঢুকিয়ে বাপিকে রায়পাড়ার মোড়ে ফেলে আসা হবে, এটাও ঠিক করে রেখেছে ছোটা মহেন্দ্র। কথা ইজ কথা। আপাতত রেডি হয়ে আরও কয়েক ঘণ্টা গুয়েট করা ছাড়া তাদের হাতে উপায় নেই।

তিন

"তোমার ভাল লাগছে আমার সঙ্গে এভাবে মিশনে যেতে? যদি সব শেষ হয়ে যায়?"

"সেইজন্যেই তো যাচ্ছি। শেষ হলে একসঙ্গে শেষ হব, জিতলেও একসঙ্গে জিতব। কিন্তু আমার একটা বথা আছে চাকু। যদিও জানি এখন এসব বলার নয়, আর একটু পরেই আমরা রঙনা দেবো, তবু, বলতে ইচ্ছে করছে।"

"বলো আনা..."

"তুমি কি সত্যিই পারো না এসব ছেড়ে আবার আগের জীবনটায় ফিরে যেতে? সঙ্কয় তো আছে অনেক। কোনও একটা গ্রামে একটা ছোট্ট বাড়ি কিনে চলো না নিজেদের সংসার শুরু করি। এই অস্ত্র, দখল, যুদ্ধ, এসব করে শেষমেশ কি আদৌ শান্তি পাবে তুমি? বলো?"

"আমি তো শান্তির জন্যে এসব করছি না আনা, তুমিও সেটা ভালভাবে জানো। আমি আমার জন্মভূমিকে শেষ করে দিতে চাই, যে-জন্মভূমি আমার চোখের সামনে আমার বাবা আর বোনকে পুড়িয়ে মেরেছে, আমার জীবনটা ছারমাট করে দিয়েছে। তুমি ভাবছ আমরা একটা বাড়ি কিনে সংসার পাততে পারি? কখনও পারি না। হয় ইউক্রেন সরকার, নয় চেচেন জঙ্গিরা আমাদের নিকেশ করে দেবে। তাদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে গেলে আমার দরকার ক্ষমতা। আর ক্ষমতার জন্যে দরকার তেল। খুব সহজ সমীকরণ আনা, খুব সহজ।"

"আমি জানতাম, তোমার সঙ্গে তর্ক করে কোনও লাভ হবে না। কমলালেবু যাবে? মিশনে যাবার আগে কমলালেবু খুব শুভ চিহ্ন।"

"কমলালেবু? কার, তোমার?"

"হুম..."

এরপর আনা আর চাকুভিচের শরীর মিশে গেল ওই পরীক্ষাগারের স্যাঁতসেঁতে ঠান্ডা কামরার মহোই। একে অন্যের ঠোঁট থেকে কমলালেবুর বীজ বেছে-বেছে বের করতে লাগল, তারপর দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। শেষমেশ ঘড়িতে অ্যালার্ম বাজতেই উঠে পড়ল চাকুভিচ। সময় এসেছে।

"সকলে রেডি?"

বাইরের ঘরে গিয়ে বাকিদের জিগ্যেস করল চাকুভিচ।

"ইয়েস স্যার।"

কোরাসে এবং খুব জোরে উত্তর এল। চাকুভিচের মুখে ধূর্ত স্মাইল ফুটে উঠল, যেটা আনা মোটে পছন্দ করে না।

"জাহাজের কী স্টেটাস?"

"আর আধ ঘন্টার মধ্যে লোকেশনে পৌঁছে যাবে স্যার, অল গুকো।"

"গ্রেট।"

দরজা ঠেলে পরীক্ষাগারের বাইরে এসে দাঁড়াল চাকুভিচ আর আনা, পিছনে আয়েয়াস্ত্র হাতে আরও চারজন। ভারযোত্তইয়ানায় এখন ডিপ রাত, দূরে শহরের আলো ঝলমল করছে, আর পিছনে রাতের বর্ডার গার্ড কাঁর পিঁড়িয়ে আছে প্রাচীন কার্পেথিয়ান। এসবের মাঝখানে নতুন নর্তকীর মতো ঝকঝক করছে দুটো হেলিকপ্টার।

চাকুভিচ আর আনা একটা হেলিকপ্টারে চড়ে বসতেই সেটা যথাযথ করে রাশিয়ান বাতাস কেটে উঠে পড়ল রাতের স্কাইয়ে। পিছনে বাকি চারজনকে নিয়ে ফলো টানল আরেকটা চপার। মেঘ কেটে হাওয়া কেটে দুটো পোষা হিংস্র হেলিকপ্টার এগিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, যেখানে থালায় করে ক্রাইম্যাক্স সাজিয়ে গুয়েট করে আছে শহর কলকাতা!

চার

এদিকে সবগুইতে শুভবুদ্ধিগুলা এবং ডগাইডেজারাস টিমটা কিন্তু রেডি সেডি নিচ্ছে সঙ্কের ইট যাওয়া রায়পাড়ায়। আজ পাড়ায় এন্নি বাড়িতে তুম্ব এক্সাইটমেন্ট, এতদিনে একটা কেলেঙ্কারির মতো কেলেঙ্কারি বেধেছে বটে, উস্ব!

আটটা-সাড়ে আটটা নাগাদ পৌঁছনোর কথা শালিমারে। সেইমতো যার-যার রেডি হয়ে নেওয়া, আগে দেখে নেওয়া যাক কে-কে আছে টিমে। এখানে বলে রাখা ভাল, রাশিয়ানদের ব্যাপারটা অন্নলি বিলিতি বোস এবং তাঁর টিম জানেন, বাপির কেসে জড়িত লোকজনকে বিদেশি এনিমিদের কথা বলে ভয়ক দেবার মধ্যে কোনও কৃতিত্ব থাকতে পারে না, এটা বিলিতির বিলিফ।

সুতরাং সুটকেস ভরা পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে রেডি স্যান্ডো মোহন, তিনি তিলু রায়ের ধাঁ লম্বা গাড়িতেই পাড়ি মারবেন। তিলু রায়ের সঙ্গে যাচ্ছে মায়ন এবং সেঙ্গ ফিরে আসা লাভলি। সে অত অপরাধবোধ-ফোধে ভোগে না, স্ট্রেট বাবা-মা'কে বলে দিয়েছে, বাপিকে সে গুয়ান্টি করেছিল, তাই বাপি লাইক রিঙ্গ মেরে এসেছিল। এতে বাপিকে একা দোষ দেওয়ার কিছু নেই। আর হ্যাঁ, আজ রাতে টিমের সঙ্গে সে-ও যাবে শালিমার, কারণ তার জন্যেই বাপি কেস সেয়েছে, দম্বিষ্ক তারও কিছু কম নয়। এছাড়া ঘোটা সে নিজেকেও বলতে সাহস পাচ্ছে না সেটা হল এই যে, তার লাস্ট বোধহয় লাভে গিয়ে ঠেকেছে।

কিন্তু বিলিতি বোস যে আনএক্সপেক্টেড টিম সাজিয়েছেন, তা হিটলারের পিসেমশাইয়ের কল্পনাতেও ছিল না। নিজের ভাড়াবাড়ির সামনের চত্বরে টফি দে-কে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিলিতি বোস, নিজের টিমকে তিনি এনিমিদ্ব, তাদের মতলব, নিজেদের কাজ ও পোজিশন এবং টাইমিং এক্সাক্টলি মনে নিচ্ছেন। টিমটা কীরকম?

দশ ডাঁড় ল্যাংচা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর্চ্চু চৌধুরী, স্পেশ্যাল পচা ল্যাংচা, ইনস্যান্ট ডাইহিয়া গ্যারাটি। পাশেই কড়োক পাঁড়া পকেটে পুরে টিপখাতা হাত, যার উপর কী এক গোপন কারণে এখনও টফি দে অভিমান করে আছে। এপাশে যুল ঘচার্যাই টিম নিয়ে কুমারকীর্তন, গানের লাইন-আপ রেডি। এ গান শুনে নাচবে না এমন উটপাখিও জন্মায়নি, জঙ্গিল তো জাস্ট মানুষ। সঙ্গে দেড় পাতা ইংরেজি ডাইপ দিয়ে লোকেন সেন, যে-ডাইপ আওড়ানোর পর কার কী অবস্থা হবে কেউ বলতে পারে না। শেষে লাস্ট বাট নট দ্য একেবারেই শিল্পি স্বয়ং শিল্পী সঞ্জয় সোম, বাঁধে সেতার, মনে নিজের বানানো রাগ। এর আগে প্রয়োগ করেননি কোথাও, আজই টেস্টিং হয়ে যাবে। পাশে ব্যাগের ভিতর তবলা-বাঁয়া পুরে স্ট্যান্ডিং নতুন রিকুটমেন্ট, মৃণাল শীল (ফারুকাবাদ)। আগের দিন নাইট ক্লোর্সে গাড়ি বাড়ি বিক্রি এঁদের রাজি করানোর কাজটা করেছেন বিলিতি বোস, অ্যান্ড উইথ টফি দে।

সকলেই কিন্তু এক কথায় রাজি হয়েছে। দেশের জন্যে কাজ করার এমন সুযোগ কেউই ছাড়তে চায় না। তাছাড়া বিলিতি বোস ভেবেছিলেন, সস্রাসের এগনেসটে শিল্প। পরিব্র পিস্তল শিল্প। এ লড়াইয়ে রিস্ক বিস্তর, কিন্তু জিতে যদি যাওয়া যায় একবার, সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের ধুন্ধুমারিয়া পড়ে যাবে। একটা যাকে বলে গিয়ে পৃষ্টান্তমূলক ইয়ে স্থাপন করা যাবে আর কী। তবে ইন্টারন্যানালদের সঙ্গে যে লোকাল ক্যাওলাঁদল ভিড়ে একেবারে কলঙ্ক-কাসৈর মামামামি হবে, সে আক্কার বিলিতি বোসেরও ছিল না। তবে, বিধাতা আছেন। মানতে হবে। নইলে একটা লোকেশন শামিমার, আর-একটা লোকেশন গিরিশ পার্ক হতেই পারত। হয় তো নি! সুতরাং এই চান্স নিজেদের এবং নিজেদের শিল্পকে প্রভ করার। এই মহৎ মোটিভেশনে আপাতত গোটা টিম ফুটন্ত। সেই তিনটে সারাইমারা গাড়ি নিয়ে রেডি গজা মেকানিক আর দুই ড্রাইভার, তারাও যান লড়িয়ে দিতে রাজি। আর ভেবে দেখতে গেলে, একমাত্র বিলিতি বোস আর তাঁর টিমই জানে যে, শত্রু এক নয়, ডলন। বাবিকা কেউ, মানে ইনকুভি চাকুভি এবং ছোটা মহেন্দ্র জানেই না, কী ছুশেন্থ আসতে চলেছে। এই চরম অ্যাডভেঞ্চেঞ্চ এবং নাচাই তেজ নিয়ে রাতের অন্ধকারে রায়পাড়ার বুকে স্টার্ট চমকাল তিনটে আতাছাপ আত্মাসাডার। 'বন ভয়াঙ' মনে-মনে নিজেকেই বললেন এজেন্ট বোস।

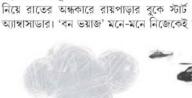

এইবার ক্রাইমাক্স যেখানে পাল্লাপাল্লা চিতাবাঘ হয়ে গুঁড়ি মেরে রয়েছে, রাতের ডার্কনেসে সেই শামিমার শিপইয়ার্ডের ক্যারেক্টারটা এট্টু আক্কার করে নেওয়া যাক। বেশ কয়েকটা এরিয়া এখানে মানুষজনের পায়ের ছাপ ছাড়াই নিন গুজরান মারে, সেইরকমই একটা শেডে বাপিকে নিয়ে অপেক্ষা শানাচ্ছিল টিম ছোটা মহেন্দ্র। বাইরে থেকে বেমলে বোঝা যাবে না, কিন্তু অমাবস্যার ক্লাসট পরের রাত, তায় শনিবার, গোটা শিপইয়ার্ডের ভাঙাচোরা শেড ও তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া কালো ঘকঘকে ওয়াটারের উপর শনির একটা গাঢ় শ্যাডো নিয়ে এসেছিল বটে। যেন কোনও বালুরি বাদুড় ল্যান্ডিং মারছে, যেন কোনও আতঙ্ক জেলফিশ ঘটিয়ে ফিরে আসছে ডোরায়। এইরকম বাইরে থেকে হেবি শাস্ত, ক্লাসট অ্যানালর সঙ্গে আর কী, ভিতর থেকে ঝুনুর্মাণি ডিপসেন্স! ভয়ঙ্কর যেন নেওয়াই যায়, নিয়তি নিজে একটা লাস্ট ওভার বল করতে নেমেছে, আক্কিং রেট সাউথ সিটির চেয়েও হাই।

যাহা, রাশিয়ানদের অত্রুতরা জাহাজ যখন ডকে এসে গদাম ভেড়ে, তখন ছোটা মহেন্দ্র পুরনো হিঁদি পেপারে 'মনোহরি রঞ্জিত' কমিকসটা পড়ছিল। বিনলিসা আর তার দুই শাকরেদ হাসিঠাট্টায় জ্যাম, বনা-মনা কী করছিল এতক্ষণে আর বলে দিতে হবে না। বাপি কেঁদে চারাট্ট হয়ে চুপচাপ বসেছিল। জায়গা টোটাল অন্ধকার, কেবল পাট্ট করবে বলে ছোটা মহেন্দ্র পকেট থেকে বার করে নিম্মি চিঁর জ্বেলেছিল। আর সেই হল তাদের কাল।

জাহাজে ভিড়েছিল টোটাল পাঁচজন, তারা এদিক-ওদিক টালি টহল মারতে-মারতে যেই না টিম ছোটা মহেন্দ্রকে ডিসকভার করেছে, বিনলিসরা কিছু করে উঠতে পারার আগেই কজা করেন। শেডের মধ্যে একটা হালকার উপর লাইট করে হাথাপাঙ্গ হল বটে, কিন্তু সে বড় নিরিভ় ছলনা। বিনলিসরা ভাবল বাপি বাবা পুলিশ এনেছে, তারা জান লড়িয়ে দিল, গুলিকে রাশিয়ানরা ভাবল ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স একনি ধরে টানা থাপটি দিয়ে মেরে বসে আছে। তাদের অবশ্য জান-যান লড়াতে হল না, এমনকী ফায়ারও ঘটাতে হল না। যে-চেহারা নিয়ে তারা লাড়াও করেছে, ইভেন বিনলিস বা ছোটা মহেন্দ্রও এইরকম ইউম্যান চাসিস কখনও দেখে করেনি। বিনলিসর পিস্তল-টিস্তল ফলানোর আগেই তারা দু'-চারটে এঁড়ে ঘুষি আর থাবড়া চালিয়ে দিয়েছে, সেইসঙ্গে কুশ পাঁচা। সাড়ে চার সেকেন্ডের মধ্যে ছোটা মহেন্দ্র, বিনলিস আর তার দুই শাকরেদের মাথায় গামাগাদা ঠেকিয়ে পীঁড়িয়ে পড়ল তিন রাশিয়ান। বনি দু'জন ঘুরে-ঘুরে এদিক-ওদিক পাহারা দিতে লাগল।

ছোটা মহেন্দ্র উপ রাগ এসে গেল কিছু বলে উঠতে পারে না। তাই আক্কাঙ্ক ডিফ্মিডে নীরবতা তার চোয়াল বেয়ে নামেছে, আর বিনলিস ভাবছে বাপিও বাবা এতগুলো বিদেশি পুলিশ অ্যারেঞ্জ করল কোন ঐশ্বরিক এলেমে? আর বন্দিবাপির প্যাকেট নড়াচড়া বন্ধ, কারণ, ভিতরের জিনিসপত্র সব কাছু কিসমিসে পরিণত হয়েছে। তাকে দিয়ে রাশিয়ানরা কিইবা ডাবিত নয়, কারণ একে গুই বিনীত বডি, তায় গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা। সুতরাং এই কেলেঙ্কারি সিনে বাপি ফুল নেগলেক্টেড। যদিও সে বুঝতে পারছে, বড় ধরনের কিছু একটা বেধেছে এখানে।

এই যখন অবস্থা, তখন একসঙ্গে দুটো ব্যাপার ঘটিছে। বরজার বাইরে কিছু দূরে গাঁং পার্কিং মেরে সাংঘাতিক টিম নিয়ে লোকেশনে নিভৃত এন্ট্রি মারছে বিলিতি বোস, সেইসঙ্গে এলাকা কাঁপিয়ে শেডের ঠিক পাশেই জলের ধারে নেমে আসছে দুটো হুমলো ভপার। সেখান থেকে কারা নামছে, তা আর বলে দিতে হবে না। ইন্টেলিকস্টারের আঙ্গাজ পেয়ে বিলিতি বোস বুঝল, দু'তরফের শিকারই হাজির, এখন যেলাটা নিজেদের মতো করে আঙ্গারস্ট্যান্ডিং করে নিতে হবে। টিম তিনি, বলতে নেই, তৈরি যা করেছেন, সকলে যার-যার পোজিশনে ঠিকঠাক পারফর্ম করতে পারলে কোনও বিটলে তাঁদের ঠেকাতে পারবে না।

তারা যখন নেকড়ে স্টেপিং-এ প্রবেশিং মারছে, তখন বিলিতি বোস বেশ কিছুটা লাইট জ্বালা হয়েছে, সানগ্লাস পরে সেখানে ঢুকেছে চাকুভি, আনা, আর দলের অন্য চারজন। তারা অপারেশন শুরু করবে, তার আগে অবস্থা পাল্লুয়া।

"এরা কারা? এদের আটকে রেখেছ কেন?"

"স্যার, সম্ভবত এরা কলকাতা ইন্টেলিজেন্সের লোক, কাল থেকে ঘাপটি মেরে বসেছিল।"

"ইম্পসিবল। এদের মুখ দেখে তোমাদের মনে হয় এরা ইন্টেলিজেন্সের লোক? ডিলিং শুরু হয়েছে?"

"হয়ে যেত, তার আগে এদের পেয়ে গেলাম। আপনার আসার অপেক্ষা করছিলাম।"

"সামান্য কাজের জন্যে কখনও অপেক্ষা করবে না, আগেই বলেছি। এদের মেরে জলে ফেলে দাও। আর এই ছেলেটা কে?"

"একে মেন হয় স্যার এরাই আটকে রেখেছে, চোর-টোর কিছু হবে।"

"যা-ই হোক, বাঁচিয়ে রাখার দরকার নেই। কাজটা তাড়াতাড়ি করো, আমি এখুনি হোটেলে বেরিয়ে যাব, আনাও যাবে আমার সঙ্গে। টাইম বম ঠিকঠাক জায়গায় লাগানো হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"ওকে। যে-কোনও স্রেট দেখলে আমাকে একটা বিপ দেবে। আমি হোটেলে গিয়েই সেট আপ করে এখানকার সরকারকে সিচুয়েশনটা শুনিয়ে দিচ্ছি। দেখি তারা কী করে।"

এই কনভারসেশনটা যখন রানিং, তখন একবারসে ছোটা মহেন্দ্র বলে যাচ্ছে, "আমাদের ছেড়ে দিন বিলাতেই বাবু, আমরা কেউ পুলিশ নই।"

বিলকিসও দেখাদেখি একই কথা রিপিট দিচ্ছে, কিন্তু হচ্ছে কী, ওরা বলছে ইউক্রেনি ভাষায়, এরা বাংলায়। যখন ল্যাঙ্গুয়েজ মিলছে না, আর নভেলের মতো সাবটাইটেলও জীবনে নেই। কেবল দু'দলই একটা শব্দ বুঝতে পারছে, পুলিশ। আর তাইতে বিপদ আরও বাড়ছে।

এইবার যখন ওরা ছোটা মহেন্দ্র অ্যান্ড টিমকে টেনে হিঁচড়ে জলের ধারে নিয়ে যাচ্ছে আর সঙ্গে ল্যাংটো বাপিও আছে, একটা ভাবখ শোনা গেল।

"দ্য অ্যাটাকিং অফ দ্য নেশন বিলিডস ইন ডাই হার ডু সর্ন আসা ইন দ্য মোমেন্টাম অফ পেট্রিওটিজম ডু অ্যান্ড ওনদি রাপার্স, হুম উই গিভ টু বার্থ ন্র ফ্রিডম। অ্যাকচুয়ালি টু ফিয়ার উইথ হেল প্রমিস ইজ ডান সর আসা।"

এরপরেও গরম-গরম আরও দু'-তিন বাক্য ছিল, যা ঘোর রাশিয়ানদের সামনে শড়বেন ভেবে স্পেশাল কেয়ারিং নিয়ে লিখে এনেছিলেন লোকেন সেন, কিন্তু সেই অব্দি আর পৌঁছতে হল না। রাশিয়ান টিমের মধ্যে যে-দু'জন ইংরেজি বিন্দুমাত্র বোঝে, তারা দেন অ্যান্ড দেয়ার বন্দুক মাটিতে রেখে কাতরাতে শুরু করল। এই সুযোগ, টি-শার্ট আর ক্যাপ্রি পরা লাভলি পিছন থেকে ক্যারাটের সমস্ত লাথি উঞ্জাড় করে দিল আনাকে। সে মুখ ফিরিয়ে লাভলিকে বাঁধবা করে দেওয়ার জাস্ট আগেও মোমেন্টে একটা অপার্থিব কিক তার নরম চোয়াল আলগা করে দেওয়ায় বন্দুক চালানো আর হল না, তার আগেই আনা লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়।

কী হচ্ছে বুঝতে না পেরে চরম চেঁচিয়ে উঠল চাকুভিচ, বাকিদের নির্দেশ দিল এলোপাথাড়ি গুলি চালাতে। কিন্তু টিম বিলিডি এই সব কিছুর জন্যেই তৈরি হয়ে এসেছিল। তারা সকলে একসঙ্গে রিভিলিং দিচ্ছে না কিছুতেই, যে-যার ভাগের কাজ সেরে আবার চুপি মেরে যাচ্ছে, ফলে ব্যাপার টোটাল ঘাঁটা। এরই মধ্যে অবস্থা লিলড়ুম বেধে গুলি ছুলে হামাগুড়ি দিয়ে পালাচ্ছিল ছোটা মহেন্দ্র আর বিলকিস। তারা বুঝে গিয়েছে, মালগুড়ি আসায় কিছু হবে না, এখন নিজের লাইফ নিয়ে ফিরতে পারলে অনেক। কিন্তু ভেজাল বড় লাঘ। শেডের দরজার কাছাকাছি হামা মেরে আসার পরই হলো, এই হাড়ক্যালানো

অ্যাকশনের মধ্যে কে বা কারা যেন দু'হাঁড়ি ল্যাংচা রেখে গেছে। খুব কৃশিয়ান একটা ডিসিশান, এবং তত নিতে হবে। ছোটা মহেন্দ্র আর বিলকিস একবার নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করে একটা লাইফটাইম আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেরে নিল। অর্থাৎ, প্রাণ যখন বেঁচেই গিয়েছে, ইমিডিয়েট মিষ্টিমুখ করার ব্যবস্থা বয়ঃ ভগবান করে দিয়েছেন। তাঁকে কি আর ফেলানো যায়? এই বলে তারা দুজনে দুটো ল্যাংচা মুখে পুরল। চকাম-চকাম করে রস ফুরল, তারপর কুচুং-কুচুং করে কামড়ে কৌত করে গিলল। কিছু না। জাস্ট সাধারণ দেখতে দুটো মেরুন ল্যাংচা। ব্যাস। তারপর তাদের স্বরণে আর কিছু নেই। বলে রাখা ভাল, বিলকিসের সুই শাকরেদরও একই দশা হয়েছিল, তবে হাঁ। ধনা-মনা তিনটে করে মেরে দিল টপাটপ। তারপর ডিরেক্ট কোমা।

ইংরেজি শোনার পরেও যারা ভাষাগত দূরত্বের কারণে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দিকে অদৃশ্য অ্যাঙ্গেল থেকে আকর্ষষ সাল-সাদা চাপাটা বুলেট এসে লাগতে লাগল, যাদের ডাকনাম পাঁড়াঃ। রাশিয়ানরা বুলেট এনকাউন্টার করতে জানে, কিন্তু পাঁড়া-অ্যাটাকের সামনে পড়ে তেবলে গেল। সেই সুযোগে কারও মুখ ফাটল, কারও হাত ভাঙল, কারও মাথা চৌচির। ওই, পাঁড়াঃর ষ্টাইকেই।

চাকুভিচ মোটামুটি পাগল হতে বসেছে। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স যে এই জায়গায় এগিয়ে গিয়েছে, সে ভাবতে পারেনি। এবং একদিন আগেরে ডাউ দিয়েও তাদের বোকা বানানো যায়নি, এ জাস্ট অভাবনীয়। অন্য লিডার হলে পালাত, কিন্তু সে জাত ইউক্রেনি। আগে আনার জান ফেরানো দরকার। সে ফিল স্ট্যান্ডিং তিনজন রাশিয়ানকে নির্দেশ দিল, যেখান থেকেই পারো, এদের খুঁজে বার করে খতম করো। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে সেটা না হলে গোটা মিশনটাই ভেস্তে ভ হয়ে যাবে।

এই মোমেন্টে অকৃতোভয় লাভলি একটা পাজামা বের করে সেঁড়ে গেল বন্দিবাপির দিকে। বাপি মোটামুটি বাঁচার হাঁচা ত্যাগ করেছিল। সেই মোমেন্টে একসঙ্গে পাজামা আর লাভলিকে দেখে আটকাতে পারল না। এই করল। লাভলি ঘেয়ান করেনি, সে যেদিকে পিছন করে বসে বাপির হাতের বাঁধন খুলছে, সেদিক থেকেই, মানে তার ব্যাক সাইড থেকেই বন্দুক নিয়ে এগোচ্ছে একজন। এই ক্যারাটেক্যাকে বাঁধারা করে ফেলার সাইলেন্ট পরিকল্পনায়। বাপিও হাঁ করে লাভলির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে ব্যাপারটা ঘেয়াল করেনি। কিন্তু রাশিয়ান গুঙ্গলে লোকটা ট্রিগারে টংকার দিতে যাবে, এমন সময়ে একটা জিনিস দেখে ভ্যাবাগ্রিই হয়ে গেল সে। লাভলি উড়ে হয়ে বসে বাপির বাঁধন কাটবি বে তুই করছে, আর সেই সুযোগে ডি-লাট উঠে গিয়ে ক্যাপ্রি নেমে গিয়ে লাভলির ভুস কোমর গুপেন হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে গুপেন হয়েছে তার সব্যটাঃ হরিদের মাথা আর শিঙের জায়গায় দু'দিকে ঝুলে পিগ্রলের নল। ব্যস। রাশিয়ান লড়াকুদের পরিব্রতম চিহ্নের সামনে অস্ত্র দেখানো মহাপাপ। নরকে গেলেও জায়গা হবে না, ভাড়াবাড়ি খুঁজতে হবে। গুঙ্গলে লোকটা বন্দুক মাটিতে নামিয়ে রেখে লাভলির পায়ার প্রতি প্রণাম ঠেকিয়ে মাটিতে বসল। সেই মোমেন্টে তার মাথার পিছনে একটা ফ্রাইং পাঁড়াঃ ডাউন হতে মারল। টোটাল অন্ধকার।

চাকুভিচ তখন বিপদ বুঝে অজ্ঞান হওয়া আনা মারিনাকে কাঁধে ফেলে রেডি হাথা মার্সেডিজের দিকে ধাবমান। তাকে যে করে হোক হোটেলে পৌঁছতেই হবে। একবার সেখান থেকে সিগন্যাল বুটি করে নিয়ে সরকারকে হুমকি দিতে যেলাতে পারলেও কিছুটা সময় কেনা যাবে। তবে তার দলের লোকজনের যা অবস্থা, ক্লিনিং কী করে চালু হবে সে জানে না। সেসব অবশ্য পরের ভাবনা, আপাতত হোটেল। এই মর্মে চাকুভিচ যখন আনা মারিনাকে ক্যারি মেরে গাড়ির দিকে সেঁড় লাগাল, তখন একদিকে এরিয়া ঝাপসা করে কামব্যমিয়ে বৃষ্টি নামল, আর-একদিকে নীরবে বাপি আর লাভলির প্রতি এগিয়ে এল মারাত্মক বুটো বন্দুক হাতে দু'জন সাত ফুট ইউক্রেনি গামবাট।

বাপি আর লাভলি তখনও টের পাচ্ছে না, কারণ এই ডেঞ্জারাস মিলনে তারা আত্মহারা হয়ে পরস্পরকে বারবার জাপটে ধরছে এবং গুপেনলি চকামচট্ট চুমু খেয়ে যাচ্ছে তো যেয়েই যাচ্ছে। হাঁহ তক্ষণে সিন থেকে বাঁ। অফস্ক্রিনে এই দৃশ্য দেখে ডবল আত্মহারা হয়ে এল অপরকে টাইট প্যেপেসিপি করযেন তিনু রায় ও স্যান্ডো মোহন, তাঁদের আনন্দ আর ধরে না। না-ধরার আরও একটা কারণ অবশ্য এই যে, কড়কড়ে দশ লাখ টাকা বেহাত হল না শেনেমেখ। অবশ্য ছেলেমেয়ের এই মহিতিমিলনের কাছে টাকা ফু! এইরকম বন্দুকময় পাথাবেয়া তাঁদের কারও ফ্যামিলিতেই বড় একটা হয়-টয়নি আর কী। মাথন এই দৃশ্য দেখে ভাবছে সব ছেড়েছুড়ে রাশিয়ানদেরই জয়েন দেবে কিনা।

এই মোমেন্টেই লাভলি আর বাপি ফন্স, খটাস। অর্থাৎ, গান লোডেড। দু'জনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এদিকে ফিরতেই দুই সাতফুটিয়ার মুখ দেখতে পেল এবং বুঝল এভাবে এবং এখানেই তাদের লাভ-লাইফ এন্ডিং মারবে। তারা নিজেদের আরও বেশি করে জাপটে একটা লাস্ট আঠালো কিস যেয়ে নিল। ততক্ষণে কপালিপ্থি একটা করে নল ঠেকে রয়েছে। অফস্ক্রিনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেই হুহু কেঁদে চলেছেন তিনু রায় আর স্যান্ডো মোহন। 'মায়নে পেয়ার কিয়া' যে মুহূর্তে 'এক বুঙ্গে কে নিয়ে তে টার্ন নেবে, এ তারা ভাবতেও পারেননি। দু'জনেরই ইচ্ছে একটা লাস্ট ডাইভ মারেন, কিন্তু বিলিতি বোস তাঁদের ঠেকিয়ে রেখে ভরসা দিয়ে যাচ্ছেন।

ওই দুই সাতফুটিয়া লাভলি আর বাপিকে পিছন থেকে শ্যাডো করেছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের পিছনটা সুল গুপেন রেখে দিয়েছে। আর সেই সুযোগে সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়েছে বিলিতি বোসের একটা খতরনাক টিম। একই সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুটোকে হাপিশ করে দেওয়ার জন্যে তারা ট্রিগারে হাত রেখেছে কি রাখেনি, পিছনে একটা খটাস করে আওয়াজ শুনতে পেল, যেমনটা একুঁ আগে নিজেদের হাত থেকে শুনেছে। কিছু না। কভাল। কেস একটা। পিছনেও গান লোডেড।

তারা ঘুরে হাঁ হয়ে দেখল থোল কভাল নিয়ে মায়াবী পোজে দাঁড়িয়ে কুমারকীর্তনা। সাতফুটিয়া দু'জন বন্দুক তোলার আগেই কুমারকীর্তন তাঁর মোহিনী ম্যাজিক মারলেন। অনেকদিন আগে একটা গান হেবি হিট করেছিল। 'তোফা তোফা তোফা তোফা...লায়া লায়া লায়া লায়া...'। সেইটে শুরু করলেন তিনি। বাণীতে বলছেন, 'ওলো ওলো ওলো ওলো...সখী সখী সখী...কানুকে বল না পিয়ে, বারে কাল আমার বিয়ে, সে কি ঠিক তারই আগে আসবে এ এ...আমার যুঁথে ভালবাসবে। ওলো ওলো ওলো ওলো... সখী সখী সখী সখী...' হিপ গান এমনিতেই রাশিয়ায় বন্দুকের চেয়েও পপুলার। এই না শুনে দুই গামবাট বন্দুক হাতে নিয়েই ডিঙ্কডোনাই নাচতে লেগেছে। এটাই দরকার ছিল। এই দেখে বাপি লাভলিকে বলল, "ওলো, বেরিয়ে যাই।"

লাভলি নরম চোয়াল শক্ত করে বলল, "পাঁড়াও। যারা আমাদের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়েছে, তাদের ক্ষমা নয়।"

এরপর নাচন্তী জঙ্গিদের কোমরে দুটো হাই হিলের খটাস আওয়াজ হল। স্লিপ ডিঙ্ক।

এতসব ব্যস্ততার মধ্যেও বিলিতি বোসের ডিসচাংয টিক ঘেয়াল করেছে যে একটু বড়ে একটা মার্সেডিজ উদোম বরসাতের মধ্যেই গুড়ুম নিচ্ছে। এখানে দয়িত্ব আর বিশেষ কিছু নেই, বাকিদের মনোমতো গ্রাণ আপ করতে বলে গজা মেকানিকের স্পেশ্যাল গাড়িতে চড়ে বসলেন তিনি, সঙ্গে তাঁর টিমের মোস্ট প্রেশাস দুই অস্ত্র। মার্সেডিজটাকে ফলো যখন মারতে যাবেন, তখন বৃষ্টিভেজা একটা ফোর্স ঢুকতে দেখলেন বিলিতি, মেনলি জিপ। এই দরজা দিয়ে সুতরাং চাকুভিচ পালাতে পারবে না, তাকে পশ্চিমের দরজা দিয়ে বেরো। গাড়ি ঘোরাতে জাস্ট বলবেন গজা মেকানিকেক, এমন সময়ে জানলার বাইরে বন্দুকের নল এবং অনিমেষ ধরের বহু প্র্যাকটিস করা স্মল বাক্য, "হ্যান্ডস আপ!"

"আপনি?"

কোস্টেন রাখলেন বিলিতি বোস।

"আমরা ইন্টেলিজেন্স। আমাদের কাছে খবর আছে।"

"খুব ভাল। আমরাও ইন্টেলিজেন্স। আমাদের কাছেও খবর ছিল, তারা এখন হ্যান্ডস ডাউন করে গুলিকে পড়ে রয়েছে, আপনি স্বান্ধদে কালেক্ট করে নিতে পারেন।"

অনিমেষ ধর বুঝতে পারলেন না লেটে ঢোকার জন্যে হাত কামড়াবেন না ভ্যাগকে ঘ্যাঙস লাগাবেন। তিনিও কোস্টেন রাখলেন, "ওহো। আর আপনি?"

"বোস। বিলিতি বোস।"

এরপর গজা মেকানিকের ধ্বজা গাড়ি ব্যাক করে বাঁ। অনিমেষ টিম নিয়ে গ্রেফতারে ঢুকলেন শেষমেশ। পরমবীর তাঁর কেউ আটকাতে পারবে না এ যাত্রা।

শহর কলকাতার জেঙ্গিপর তেম্নি হোটেল 'বোল্ড ভ্যাম্পায়ার'। বাংলা

করলে মানে ভাল দাঁড়ায় না ঠিকই, কিন্তু হিপহপ এই পাঁচতারা হোটেল এখন শহরের সবচাইতে হ্যাপেনিং প্লেস। তার উপর এত বড় একটা হ্যাপেনিং যে ল্যান্ড করবে, সেটা কেউ ভাবেনি।

সাড়ে সতেরো ফুট বুকের মেনটেন মেরে টানা গাড়ি নিয়ে ফলো লাগিয়ে গিয়েছে গঙ্গা মেকানিক, এই ঘুমুন রেনি নাইটের মধ্যেও গাড়ির টেল লাইট ছাড়েনি সো। সঙ্গে বিলিটি ও তাঁর ডেঞ্জার গুয়েশ্বন। হোটেলের সামনে গাড়িটা কোনও রকমে ঢুকিয়ে মেরে দিয়ে আনা মারিনাকে পাঁজাকোলা করে দরজা ঠেলে ঢুকল চাকুভিচ, তারই মধ্যে এক হাতে কায়দা করে ধরে রাখা একটা গামাগান। ঢোকামাত্র স্বর্গে হুলুহুলু মঞ্চে ফুল টাইপের ব্যাপার হল। চারপাশে হোলাহোকা হুড়োহুড়ির বেন ডেকে গেল, এরই মধ্যে রেড অ্যালার্ট জারি হওয়ার সুযোগ না দিয়ে সকলকে চমকে রেখে চাকুভিচ স্ট্রেট টুকল ম্যানেজারের ঘরে। রাত প্রায় দশটা, তিনি তখন বেরোবেন বলে ব্রিফকেস গোছাচ্ছিলেন, তার মধ্যে এই ডিগনিই সয়াসের এন্ট্রি। ম্যানেজার কিছু বুঝে উঠে বলার আগেই আনা মারিনাকে টেবিলে শুইয়ে তাঁকে জাপটে ধরল চাকুভিচ, আর একটু হলে দম বন্ধ হয়ে ক্লিন ডেড হবার চান্স আছে। ঘরের বাইরে হোটেলের সমস্ত সিকিউরিটি কোরাসে হতভম্ব, কিন্তু যখন ম্যানেজারের কপালে বিশেষি বন্দুক ঠেকানো আছে বলে কোনও অ্যাকশন নিতে পারছে না কেউ। হোটেলের কাস্টমারদের বের করে দেওয়া হয়েছে এর মধ্যেই।

কানের গোড়ায় মুখ ধরে রেখেই চাকুভিচ ম্যানেজারকে বলল, "রুম থ্রি টু ওয়ান। নিয়ে চলো। এক্ষুনি।"

ম্যানেজারের কাছেও সারেন্ডার মারা ছাড়া কোনও রুট খোলা নেই। তিনি চাকুভিচকে নিয়ে বেরোলেন, যদিও জাপটে ধরার অ্যাকশনে ম্যানেজারের গোটা চাকুভিচসহ বুকে ঠেসে রাখা, রাশিয়ান লোমের সুভূষ্ড়িতে হাঁচিও পাচ্ছে তাঁর। সেসব অগ্রাহ্য করেই রুমপাসে চাকুভিচকে নিয়ে যাচ্ছিলেন ম্যানেজার, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে চাকুভিচের মনে পড়ল, আনাকে শোয়ানো আছে ম্যানেজারের ঘরে। চাকুভিচ যাবে না থাকবে, নাকি এক হাতে গান অন্য হাতে মারিনাকে নিয়ে তবে যাবে, এই থার্ড অপ্শয়ার মার্কা দ্বন্দ্বায় পড়ল এবং দেখতে গেল ভিড়ে ভিড়াক্কার করিডোরে লোক সরিয়ে স্লো মোশনে এগিয়ে আসছে একটা ফুলুপেল ভিজে মাখবরসি পুরুষ, হাতে কোনও অস্ত্র-ফস্ত্র নেই। তার হাল্কার উপর লাইট করে কাঁচাপাকা চুলে জেলের ক্লিপেরা কানামাছি খেলছে। সাধারণ পোশাক পরা লোকটার চোখ কেবল বলে দিচ্ছে, সে সাধারণ নয়। পিছনে একটা ফোর্স তো পাওয়া টাইপ নাছ্ছে ছেলে ফলো টানছে।

এরপর, যা আমরা সবাই জানি, চরম অ্যাকশনের আগে ডায়লগ, যার জন্যে টিকিট কাটা সাকসেস।

বিলিটি বোস একটা পোজ নিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর ডিপ ভয়েসে বললেন, "তোমার নাম কী আমি জানি না, কিন্তু তোমার যেন যত্তম।"

এখানে বলে রাখি, কর্মসূত্রে বিলিটি এবং ধর্মসূত্রে চাকুভিচ কিছু ইংলিশ জানে। সেটাকে বেস করেই কথাবার্তা হচ্ছিল। বিলিটি বোস আবারও বললেন, "সত্যিই তোমার যেন যত্তম। বন্দুক ফেলে দাও।"

এতক্ষণে চাকুভিচও মুখ খুলল, "তোমার নাম কী, আমিও জানি না। কিন্তু তোমার দুঃসাহস দেখে হাসি পাচ্ছে। কোনও অস্ত্র আর লোকজন ছাড়াই তুমি আমাকে হুমকি দিচ্ছ? জানো তোমাকে আর এই ম্যানেজারকে আমি এসসেজে উড়িয়ে দিতে পারি? জানো তোমার শহরটাকে কয়েকটা বোতাম টিপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারি আমি? জানো এসব?"

"সব জানি।"

বিলিটি বোসের কণ্ঠে ডিপ ফ্রিজের শান্তি।

"কিন্তু তুমি কি এটা জানো যে এখন তোমার দিকে শার্প স্নাইপার তাক করা আছে? আমার আঙুল নড়ার অপেক্ষা শুধু। তারপর...তাকাও ওদিকে..."

বিলিটির আঙুল ফলো মেরে চাকুভিচ দেখতে পেল, করিডোর ছাড়িয়ে গিয়ে লাউঞ্জের সেতলার ব্যালকনি থেকে সত্যিই তার দিকে একটা অস্ত্র তাক করা। কিন্তু মালটা কী সেটা বুঝে উঠতে পারল না। ঘাবড়ে গিয়ে জিগ্যেস করল।

"স্নাইপার? ওটা স্নাইপার? হাসালে।"

"হ্যাঁ। ওটা স্নাইপার। বাংলায় আমরা সেতার বলে ডাকি।"

এরপর মোমেন্টের মধ্যে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে গেল। বিলিটি বোস স্নাইপারের দিকে চেঁচিয়ে 'শুট!' বলে উঠতেই সঞ্জয় সোমের সেতারে একটা প্রাণঘাতী গৎ বেজে উঠল। সঙ্গে লাউঞ্জের মেঝে থেকে ডেভলি সঙ্গত লাগাল মৃণাল শীল (ফারুকাবাদ)। ব্যাপারটা এত জত আর এত অকল্পনীয় যে কিছু ঠাহর করে ওঠার আগেই চাকুভিচের মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল। সে এ জিনিস আগে শোনেনি, কোনও দিন শুনবে বলে ভাবেওনি। সেতারের ছিঁড়ে দশ বারোটা স্ট্রোক শোনার পর তার হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল, সেই মোমেন্টে গতের মুখড়া ফাঁকা পেয়ে মৃণাল শীল একটা বুঁনো উঠান তুলল। ব্যাস! চাকুভিচ গম ফট। অবশ্য চাকুভিচ একা নয়। কোলাটারাল ড্যামেজ হিসেবে হোটেলের বাকি কর্মচারীরাও মেবেতে লটা। কেবল বিলিটি আর টনি দে কানে বাদ্যু তুলো গুঁজে রেখেছিলেন বলে স্মুদলি সারভাইভ করে গেলেন এবং বীরের স্মাইল নিয়ে টানটান বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। যাক। মিশন অ্যাকম্প্লিশহ্ড ম্যানেজারও অবশ্য জান হারানি, কারণ তাঁর দুটো কানই রাশিয়ান লোমের ঝোপে ঢাকা পড়েছিল। শেষমেশ বেঁচে গিয়েছেন এটা বুঝতে পেরে তিনি এবার ঘুরে দাঁড়ালেন। আর সেটা করামাত্র টলে পড়ে গেলেন বিলিটি বোস। কারণ আর কিছুই না, হোটেলের ম্যানেজার তাঁর বহুদিনের চেনা। জেসমিন। সাহিরা হক জেসমিন।

উপসংহার

একটা ঝাঝিধ্বানু ঝাঁপেয়ায় টোটাল রায়পাড়ার সিলিং মুড়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ বৃষ্টিটা টোটালি রিটায়ার করেনি, আর ঠিক পাড়ার মুখে একটা গেট, তার ডগায় লেখা 'লাভলি ওয়েডেস বাপি'। কোনও কথা হবে না। জমে গিয়েছে। সঙ্গে থেকে নহবত মতাছেন টিমসহ কুমারকীর্তন, এতদিনে পাড়ার মেয়েগিলে তাঁর ডাক পড়েছে, অতএব একটা ইটিও বাদ দিচ্ছেন না।

বলাই বাহুল্য যে, শনিবার নাইটের পরে প্রত্যেকের জীবনেই একটা করে চেঞ্জ এসে গেছে, মেজর হোক বা মাইনর। যেমন অনিমেষ বরের লেট তৎপরতায় জেলে ঢুকেছে ছোটা মহেন্দ্র এবং বিবিকিম ও তাদের দলবল শোনা গিয়েছে জেলে চিকেন তন্দুরি না পেয়ে মনা-বনা দেয়াল পর্যন্ত চাটছে। ওদিকে একই নাইটে স্পেশাল অ্যাক্টে ফেফতার ন'জন রাশিয়ান জঙ্গি, ক্লাস চাকুভিচ ও আনা মারিনা নামক দু'জন কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল কৃষ্ণকী (যাদের অনিমেষ পরে জেলেরা থেকে খারাপ অবস্থায় কালেই করেছিলেন) এবং তাদের সেপারেট-সেপারেট এলাকায় গোপনে রাখা হয়েছে। সেইসঙ্গে উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত হয়েছে প্রচুর মিসাইল, ড্রিলার ও টাইমবোমা। শোনা যাচ্ছে অনিমেষ পদ্মশ্রীরচক্র পাচ্ছেন, কিন্তু একটু লেটো। তার মধ্যে অবশ্য সর্বসম্প্রদায়ে নিয়ে শিমলাটা দুরে আসতে পারবেন।

এদিকে স্টুডেন্স ভর্তি শশ লাখ আগ্রা বাস করার এর চাইতে ভাল উপায় না পেয়ে বনাংক করে লাভলি-বাপির বিয়ে পেড়ে বসলেন তিলু রায় ও স্যাভো মোহন। তাঁরা দু'জনেই দ্রেসে মেরে গেটের দু'ধারে দাঁড়িয়ে সবাইকে বেছে 'আসুন রে হেঁ আবার এসব কেন' করছেন। ববিতা বারবার শাড়ি পাল্টাচ্ছেন বলে এখনও আসরে এন্ট্রি নিতে পারেনি। বিয়েটা হয়ে একদিন থেকে সেফ হয়েছে। লাভলির মাইন্ডে বাপির প্রতি লাভ থাকতে-থাকতে এটা মিটিয়ে নেওয়া ভাল। বাপিও ওই সেই হাতে যতদূর দেখেছে আর ফিল মেরেছে, আজ রাতে তার বাকিটা এনজয় লাগাতে চাহ। সে জানে, লাভলি আজ তাকে ছিঁড়ে খাবে। উরিব্বাবেবাপ! ভেবেই তার...একটাই বাঁচোয়া, সে আজ বাবার কোম্পানির জাঙ্গিয়া পরার রিস্টাট নেয়নি।

পাত পেড়ে খাওয়ানো। লোকেন সেনকে যখন ১৩ নম্বর বেঞ্চনিটা নিয়ে চরম সাবাসাধি করছে মাখন আর লোকেন হাত নেড়ে বলছে "ব্রিঞ্জেল ইজ ইনডুরি ফর দা গুড হেলথ পিপল", ঠিক সেই সময়ে প্যান্ডেলের পিছনে, ঝাঁপেয়ার নীচে বেঞ্চনি টুনির ঝিনকি আলোয় দাঁড়িয়ে আছেন দুই চিরকমিটেড লাভারা বিলিটি বোস ও জেসমিন। বিলিটি একটা গোলাপ জোগাড় করেছেন কেটারারের কাছ থেকে, সেটা দিয়ে জেসমিনের মধ্য ব্লিশেশ্রে মসৃণ গালে ঠোনা মেরে বলছেন,

"আমার কথা মনে পড়ত? সত্যি বলবে!"

জেসমিন কত দিন পর লজ্জা পাবার একটা চান্স দেখেছেন। ছাড়ার কোম্পেন্সই ওঠে না।

"পড়ত বলেই তো এতদিন একলা থেকে গিয়েছি। তুমি খুঁজেছিলে আমায়?"

"অনেক, জেসমিন, অনেক। খুঁজে না পেয়ে নিজেকেও যে হারিয়েই ফেলেছিলাম। আজ আবার নিজেকে খুঁজে পেলাম।"

"তুমি কিন্তু বরুণ এগ্রাইটিং কাজ করো।"

"তা ঠিকই, কিন্তু আমার জীবনে কোনও এগ্রাইটমেন্ট নেই।"

"চাও? এগ্রাইটমেন্ট?"

"আছে? তোমার কাছে?"

"আছে।"

"দেবে?"

"দেব।"

"উইল ইউ ম্যারি মি?"

এর উত্তরে বিলিতি বোসের বুকে মুখ গুঁজলেন লাজুক জেসমিন। তাঁর গালে তখন ভারতীয় লোমের পালকপনা।

এদিকে কুমারকীর্তন নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এনেছেন যাকে, সে আজ অনেকদিন পর বুক ঢেকে শাড়ি পরেছে। ময়না। চোখে জল নিয়ে নহবতের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর থেকে-থেকে কেঁকিয়ে উঠছে, 'খুব ভাল গাইছেন আজ'। কুমারকীর্তন ডিসাইড নিয়ে ফেলেছেন, এর সঙ্গেই ঘর বাঁধবেন। অবশ্য যদি বার থেকে আয়ড়ার জানিটা ময়নার শরীলে-মাইন্ডে পোষায়, তবেই।

ওদিকে রাশিয়ান সরকার এই তিড়িঙ্গোলা সংঘাতের টোটালটা ভারত সরকারের কাছ থেকে শুনে লজ্জায় নিম্নু হয়ে ক্ষমা-ফমা চেয়েছে। নেহাত আন্ডার কাভার টিমের কথা তারা সবিস্তারে জানে না, নইলে রাশিয়ার অলিম্পিকে হারু জাস্ট গেস্ট হয়েই ডাক পেত। তবে হার সে মানেনি, পরনিন থেকেই আরও ডিপ প্র্যাকটিস শানাচ্ছে।

এন্তার দেড়েকষা আইটেম গিলে লোকজন যখন প্রায় সাদা, বিলিতি জেসমিনকে এট্টু এগিয়ে দিতে গিয়ে দেখলেন গলির এককোণে টিউবের গায়ে হেলান দিয়ে বিরহীবন্ধু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টফি দে। অপারেশনের দিন সকাল থেকেই এমন ন্যানা মেরে আছে সে, নানান বিজিবনেসের মধ্যে বিলিতি আর জিগ্যেস করে উঠতে পারেননি, আজ ধরলেন।

"কী রে, এরকম মুখ লটকে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কী হয়েছে?"

"কই, কিছু না তো।"

"ন্যাখ টফি, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা করিস না। সেদিন থেকে বিগড়ে আছিস। হয়েছেটা কী? আজ সবাই এত খুশি, তোর মুখটা এরকম দেখতে ভাললাগ্যে, বল?"

"বলছি তো কিছু হয়নি।"

"ওহো, বুঝেছি। আরে ইনি তোর বউদিই ধরে নে। বল এবার। হারু কিছু বলেছে?"

"তোমাকে আর হারুর হয়ে ওকালতি করতে হবে না।"

"বুঝেছি। অভিমান। কী বলেছে?"

"হারু বলেনি। হারু আমাকে ঠকিয়েছে। সেদিন টিটোদের বুক স্টোরে গিয়ে আমি ওর ব্যাপারে একটা সিক্রেট জানতে পেরেছি। সেই থেকে... আমাকে বললেই পারত।"

প্রায় ফুঁপিয়ে উঠল টফি দে।

"আহা, এমন খুশির দিনে এসব...কী জানতে পেরেছিস শুনি?"

"হারু...হারু...হারু..."

"উফ্! হারু কী?"

"হারু সমকামী নয়।"

"তাই? তাহলে যে আগে একবার তোর সঙ্গে...তবে ও কী?"

"ও মুরাকামি।"

"মানে?"

"মানে তো আমিও জানি না। কিন্তু সমকামী নয়। সেদিন বইয়ের দোকানে এক ভদ্রমহিলা টিটোর বাবাকে জিগ্যেস করলেন, হারু কি মুরাকামি? টিটোর বাবা বললেন হ্যাঁ। ভাবো একবার, টিটোর বাবা তো টিটোর বাবা, একটা অন্য পাড়ার কে না কে মহিলা, সেও জানে হারু মুরাকামি। আর আমি অ্যাব্বিন ওকে সমকামী ভেবে ভালবেসে গিয়েছি..."

বিলিতি বোস না হেসে পারলেন না। জেনারেল নলেজের অভাব আর এট্টু হলেই একটা মিষ্টি সম্পর্ক ভেঙে দিচ্ছিল। তিনি হারুকে কাছে টেনে নিয়ে ভুলটা শুধরে দিয়ে বললেন, "ওরে পাগল, হারুকি হচ্ছে একজনের নাম। আর টাইটেল মুরাকামি। হারুকি মুরাকামি। বিখ্যাত জার্মান ইঞ্জিনিয়ার, যিনি হুইলচেয়ারের গিয়ার আবিষ্কার করেছিলেন। বুঝলি?"

টফির মুখে চুনির আলো ঝিলমিল করে উঠল।

সংহার

ডেকরেটার যখন টিউবের দড়ি খুলছে, সারা পাড়া হ্যাপিনেসের ক্লান্তিতে ন্যাতা, বিলিতি বোস জেসমিনকে গাড়িতে তুলে বাড়িতে শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন আর ম্যাডাম বি তাঁর সাকসেসের রিওয়ার্ড হিসেবে একটা প্রোমোশন আর পরের মিশনের ডিটেল টাইপ করাচ্ছেন, ঠিক তখন রায়পাড়ার একটা চামকি গলি দিয়ে দাঁড় খুঁটতে-খুঁটতে দুটো উইনিং ক্যারেক্টার হাঁটছে। তাদের কনভারসেশন দিয়েই এই নভেল শেষ করা ভাল।

"খাইয়েছে বড় ভাল, হ্যাঁ?"

"তা যা বলেছেন। এমন খাওয়া আজকালকার বিয়েবাড়িতে কই।"

"তুমি আজ আমার বাড়িতেই থেকে যাও, নাকি?"

"তা-ই ভাল।"

"যা-ই বলো ভায়া, সেদিন কিন্তু উঠানটা কেয়া বাত তুলেছিলে। ঘরানাদার জিনিস, শুনলেই বোঝা যায়।"

"সবই আপনার আশীর্বাদ দাদা। কতদিন পর এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে বাজানোর চান্স পেলাম, তা-ও আবার পাবলিক পারফর্ম্যান্স। ভাবা যায়?"

"এমন চান্স আরও আসবে। বলি কী, হপ্তায় দু'দিন করে এসো এবার থেকে। তোমার সঙ্গে আমার মেজাজটা যাচ্ছে। রেওয়াজে বসা যাবে'খন।"

"এ আমার পরম সৌভাগ্য দাদা। আচ্ছা, একটা কথা জিগ্যেস করব?"

"করো ভাই, করো।"

"সেদিন ওটা কী রাগ বাজালেন? ওইরকম এফেক্ট!"

"এক্সপেরিমেন্টাল। সন্তুরের টালমাটাল সময়ে বানানো। বোমারুবেহাগ।"

দুটো ছায়া ক্যারেক্টার হেঁটে বেরিয়ে গেল বলেই খেয়াল করল না, ভাঙা ফিশফ্রাই মুখে নিয়ে একটা ডেঁপো ইঁদুর রাস্তা ক্রস করছিল। রাগের নামটা শুনে জাস্ট পড়ে গেল। ফিশফ্রাই আজ তার কপালে নেই।